দর্পচূর্ণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫

প্রকাশক :
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
তাপস কুমার হাটাই
নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

১

সন্ধ্যার পর ইন্দুমতী বিশেষ একটু সাজ-সজ্জা করিয়া তাহার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, কি হচ্ছে ?

নরেন্দ্র একখানি বাঙলা মাসিকপত্র পড়িতেছিল ; মুখ তুলিয়া, নিঃশব্দে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সেখানি হাতে তুলিয়া দিল।

ইন্দু খোলা পাতাটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া, জোড়া ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল—ইস, এ যে কবিতা দেখছি ! তা বেশ—বসে না থাকি, বেগার খাটি। দেখি এখানা কি কাগজ ? 'সরস্বতী' ? 'স্বপ্রকাশ' ছাপালে না বুঝি ?

নরেন্দ্রের শান্ত দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া আসিল !

ইন্দু পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'স্বপ্রকাশ' ফিরিয়ে দিলে ?

সেখানে পাঠাইনি।

পাঠিয়ে একবার দেখলে না কেন ? 'স্বপ্রকাশ' 'সরস্বতী' নয়, তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এইজন্যেই আমি যা তা কাগজ কখ্খনো পড়ি নে।

একটু হাসিয়া ইন্দু আবার কহিল, আচ্ছা, নিজের লেখা নিজেই খুব মন দিয়ে পড়। ভাল কথা,—আজ শনিবার, আমি ও-বাড়ির ঠাকুরঝিকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছি। কমলা ঘুমিয়ে পড়েচে ; কাবোর ফাঁকে মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো। চল্লুম।

নরেন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, যাও।

ইন্দু চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা গভীর নিশ্বাস কানে যাইতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কিছু একটা করতে চাইলেই তুমি অমন করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন, বল ত? এতই যদি তোমার দুঃখের জ্বালা, মুখ ফুটে বল না কেন, আমি বাবাকে চিঠি লিখে যা হোক একটা উপায় করি।

নরেন্দ্র মুহূর্তকাল মুখ তুলিয়া ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে কিছু বলিবে। কিন্তু কিছুই বলিল না, নীরবে মুখ নত করিল।

নরেন্দ্রের মামাত ভগিনী বিমলা ইন্দুর সখী। ও-রাস্তার মোড়ের উপরেই তাহার বাড়ি। ইন্দু গাড়ি দাঁড় করাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, ও কি ঠাকুরঝি! কাপড় পরনি যে! খবর পাওনি নাকি?

বিমলা সলজ্জ হাতিমুখে বলিল, পেয়েচি বই কি, কিন্তু একটু দেরি হবে ভাই। উনি এইমাত্র একটুখানি বেড়াতে বেরুলেন—ফিরে না এলে ত যেতে পারব না।

ইন্দু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। একটা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিল, প্রভুর হুকুম পাওনি বুঝি?

বিমলার সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে ভরিয়া গেল। এই খোঁচাটুকু সে যেন ভারী উপভোগ করিল। কহিল, না, দাসীর আর্জ্জি এখনও পেশ করা হয়নি, হলে যে না-মঞ্জুর হবে না, সে ভরসা করি।

ইন্দু আরও বিরক্ত হইল। প্রশ্ন করিল, তবে পেশ হয়নি কেন? খবর ত তোমাকে আমি বেলা থাকতেই পাঠিয়েছিলুম।

তখন সাহস হ'লো না বৌ। অফিস থেকে এসেই বললেন, মাথা ধরেচে। ভাবলুম, জলটল খেয়ে একটু ঘুরে আসুন, মনটা প্রফুল্ল হোক —তখন জানাব! এখনও ত দেরি আছে, একটু ব'সো না ভাই, তিনি ফিরে এলেন বলে।

কি জানি কিসে তোমার হাসি আসে ঠাকুরঝি! আমি এমন হলে

লজ্জায় মরে যেতুম। আচ্ছা, ঝিকে কিংবা বেহারাটিকে বলে কি যেতে পার না?

বিমলা সভয়ে বলিল, বাপ রে! তা হলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন—এ জন্মে আর মুখ দেখবেন না।

ইন্দু ক্রোধে বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, দূর করে দেবেন! কোন্ আইনে? কোন্ অধিকারে শুনি?

বিমলা নিতান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বাধা কি বৌ! তিনি মালিক—আমি দাসী বই ত নয়। তিনি তাড়ালে, কে তাঁকে ঠেকাবে বল!

ঠেকাবে রাজা। টেকাবে আইন। সে চুলোয় যাক গে ঠাকুরঝি, কিন্তু নিজের মুখে নিজেকে দাসী বলে কবুল করতে কি একটু লজ্জা হয় না? স্বামী কি মোগল বাদশা? আর স্ত্রী কি তাঁর ক্রীতদাসী যে, আপনাকে আপনি এমন হীন, এমন তুচ্ছ করে গৌরব বোধ করচ?

এই ক্রোধটুকু লক্ষ্য করিয়া বিমলা আমোদ বোধ করিল, কহিল, তোমার ঠাকুরঝি যে মুখ্যু মেয়েমানুষ বৌ, তাই নিজেকে স্বামীর দাসী বলে গৌরব বোধ করে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি ভাই, তুমি যে এত কথা বলছ, তুমিই কি বাড়ি থেকে বেরিয়েচ দাদার হুকুম না নিয়ে?

হুকুম? কেন, কি জন্যে? তিনি নিজে যখন কোথাও যান—আমার হুকুমের অপেক্ষা করেন কি? আমি যাচ্ছি, শুধু এই কথা তাঁকে জানিয়ে এসেচি। নিমেষমাত্র মৌন থাকিয়া, অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, তবে একথা মানি যে, আমার মত গুণের স্বামী খুব কম মেয়েমানুষের ভাগ্যে জোটে। আমার কোন ইচ্ছাতেই তিনি বাধা দেন না। কিন্তু, এমন যদি না-ও হ'তো, তিনি যদি নিতান্তই অবিবেচক হতেন, তা হলেও তোমাকে বলচি ঠাকুরঝি, আমি নিজের সম্মান ষোল-আনা বজায় রাখতে পারতুম; কিছুতেই তোমাদের মত এ-কথা ভুলতে পারতুম না যে, আমি সঙ্গিনী, সহধর্মিণী—তাঁর ক্রীতদাসী নই। জানো ঠাকুরঝি, এমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত মেয়েমানুষ পুরুষের পায়ে মাথা মুড়িয়ে এত তুচ্ছ, এমন খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েচে। নিজের

সম্ভ্রম নিজে না রাখলে, কেউ কি দেয় ঠাকুরঝি? কেউ না। আমার ত এমন স্বামী, তবুও কখনও তাঁকে আমি এ-কথা ভাবার অবকাশ দিইনি—তিনিই প্রভু, আর আমি স্ত্রী বলে তাঁর বাঁদী। আমার নারী-দেহেও ভগবান বাস করেন, এ-কথা আমি নিজেও ভুলি নে—তাঁকেও ভুলতে দিই নে।

বিমলা চুপ করিয়া শুনিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, কিন্তু তাহাতে লজ্জা বা অনুশোচনা কিছুই প্রকাশ পাইল না। কহিল, জানি নে বৌ, আত্মসম্ভ্রম আদায় করা কি: কিন্তু তাঁর পায়ে আত্মবিসর্জন দেওয়াটা বুঝি। ঐ যে উনি এলেন; একটু ব'সো ভাই; আমি শীগ্‌গির হুকুম নিয়ে আসি, বলিয়া হঠাৎ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া দ্রুতপায়ে প্রস্থান করিল।

ইন্দু এ হাসিটুকু দেখিতে পাইল। তার সর্বাঙ্গ রাগে রিরি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বায়স্কোপ হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ ইন্দু বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি হুকুম না পেলে ত তুমি আসতে পারতে না।

বিমলা পথের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি জানি কি ভাবিতেছিল, বলিল, না।

তাই আমার মনে হয় ঠাকুরঝি, আমি যখন-তখন এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাই বলে, তোমার স্বামী হয়ত রাগ করেন!

বিমলা মুখ ফিরাইয়া কহিল, তা হলে আমি নিজেই বা যাব কেন বৌ! বরং আমার ভয় হয়, তুমি এমন করে এসো বলে দাদা হয়ত মনে মনে আমার উপর বিরক্ত হন।

ইন্দু সগর্বে কহিল, তোমার দাদার সে স্বভাব নয়। একে ত কখনো তিনি নিজের অধিকারের বাইরে পা দেন না, তা ছাড়া আমার কাজে রাগ করবেন, আমি ঠিক জানি, এ স্পর্দ্ধা তাঁর স্বপ্নেও আসে না।

বিমলা মিনিট-দুই স্থির থাকিয়া, গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া

মৃদুকণ্ঠে বলিল, বৌ, দাদা তোমাকে কি ভালই না বাসেন। কিন্তু তুমি বোধ করি—

এতক্ষণে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল। কহিল, তাঁর কথা অস্বীকার করি নে; কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হ'লো কিসে?

তা জানি নে বৌ। কিন্তু মনে হয় যেন—

কেন হয় জান ঠাকুরঝি, তোমাদের মত পায়ে লুটিয়ে-পড়া ভালবাসা আমার নেই বলে। আর ঈশ্বর করুন, আমার নারী-মর্য্যাদাকে ডিঙ্গিয়ে যেন কোনদিন আমার ভালবাসা মাথা তুলে উঠতে না পারে। যে ভালবাসা আমার স্বাধীন সত্তাকে লঙ্ঘন করে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

বিমলা গোপনে শিহরিয়া উঠিল।

মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু কহিল, কথা কও না যে ঠাকুরঝি! কি ভাবছ?

কিছু না। প্রার্থনা করি, দাদা তোমাকে চিরদিন এমনই ভালবাসুন; কারণ, যতই কেন বল না বৌ, মেয়েমানুষের স্বামীর ভালবাসার চেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও বড় নয়। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বিমলা পুনরায় কহিল, কি জানি, কি তোমার নারী মর্য্যাদা—আর কি তোমার স্বাধীন সত্তা! আমি তো আমার সমস্তই তাঁর পায়ে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেচি। সত্যি বলচি বৌ, আমার ত এমনি দশা হয়েচে, নিজের ইচ্ছে বলেও যেন আর কিছু বাকি নেই। তাঁর ইচ্ছেই—

ছি ছি, চুপ কর—চুপ কর—

বিমলা চমকিয়া চুপ করিল। ইন্দু ঘৃণাভরে বলিতে লাগিল, আমাদের দেশের মেয়েরা কি মাটির পুতুল? প্রাণ নেই—আত্মা নেই—কিছু নেই! আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এত করে কি পেয়েচ? আমার চেয়ে বেশি ভালবাসা আদায় করতে পেরেচ কি? ঠাকুরঝি, ভালবাসা মাপবার যে যন্ত্র নেই, নইলে মেপে দেখাতে পারতুম—যাক সে কথা—কিন্তু কেন জানো? নিজেকে তোমাদের মত নীচু করিনি বলে—তোমাদের এই

কাঙ্গাল-বৃত্তি মাথায় তুলে নিইনি বলে। আমার ভারি দুঃখ হয় ঠাকুরঝি কেন তিনি এত শান্ত, এত নিরীহ। কিছুতেই একটা কথা বলেন না—নইলে দেখিয়ে দিতুম, তিনি যাকে গ্রাহ্য করেন না, সেও মানুষ; সেও অগ্রাহ্য করতে জানে। সেও আত্মমর্যাদা হারিয়ে ভালবাসা চায় না!

ও আবার কি? মুখ ফিরিয়ে হাসচ যে?

বিমলা জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, কই—না।

না কেন? এখনো ত তোমার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েচে।

বিমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, লেগে রয়েচে তোমার কথা শুনে। ওগো বৌ, অনেক পেয়েচ বলেই কথা বেরুচ্চে।

ইন্দু ক্রুদ্ধমুখে জিজ্ঞাসা করিল, না পেলে?

বেরুত না।

ভুল—নিছক ভুল। ঠাকুরঝি, সকলেই তোমার মত নয়—সকলেই ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায় না। আত্মগৌরব বোঝে, এমন নারীও সংসারে আছে।

এবার বিমলার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল. বলিল, তা জানি।

জানলে আর বলতে না। যাই হোক, এখন থেকে জেনো, যে ভিক্ষে চায় না, নিজের জোরে আদায় করে, এমন লোকও আছে।

বিমলা ব্যথিত স্বরে বলিল, আচ্ছা, এই যে বাড়ী এসে পড়েচি। একবার নামবে না কি?

নাঃ—আমিও বাড়ী যাই। গাড়োয়ান, ঐ ও গলিতে—

দাদাকে আমার প্রণাম দিও বৌ!

দেবো,—গাড়োয়ান, চলো—

২

আর নেই—সংসার-খরচের কিছু টাকা দিতে হবে যে।

স্ত্রীর প্রার্থনায় নরেন্দ্র আশ্চর্য হইল। কহিল, এর মধ্যেই দুশো টাকা ফুরিয়ে গেল?

না গেলে কি মিথ্যে বলচি, না, লুকিয়ে রেখে চাইচি?

নরেন্দ্রের চোখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল। কোথায় টাকা? কি করিয়া সংগ্রহ করিবে?

সেই মুখের ভাব ইন্দু দেখিল, কিন্তু ভুল করিয়া দেখিল। কহিল, বিশ্বাস না হয়, এখন থেকে একটা খাতা দিয়ো, হিসেব লিখে রাখব। কিংবা এক কাজ কর না—খরচের টাকাকড়ি নিজের হাতেই রেখো—তাতে তোমারও ভয় থাকবে না, আমিও সংশয়ের লজ্জা থেকে রেহাই পাব। বলিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল তাঁহার মুখের গাঢ় ছায়া বেদনায় গাঢ়তর হইয়াছে!

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, অবিশ্বাস করিনে, কিন্তু—

কিন্তু কি? বিশ্বাস হয় না—এই ত? আচ্ছা যাচ্ছি, যতটা পারি হিসেব লিখে আনি। উঃ—কি সুখের ঘর-কন্নাই হয়েছে আমার! বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কিন্তু কেন? কিসের জন্য হিসেব লিখতে যাব—আমি কি মিথ্যে বলি? আমার মামাত বোনের বিয়েতে কাপড়-জামা লাগল—পঞ্চাশ টাকার উপর। কমলার জামা দুটোর দাম বার টাকা——সেদিন বায়স্কোপ খরচ হ'লো দশ-বার টাকা—খতিয়ে দেখ দেখি, বাকি থাকে কত! তাতে এই দশ-পনর দিন সংসার-খরচটা কি এমন বেশি যে, তোমার দু'চোখ কপালে উঠেচে! আমার দাদার সংসারে মাসে সাত-আটশ' টাকাতে যে হয় না। সত্যি বলচি, এমন করলে

আমি ত আর ঘরে টিকতে পারি নে। তার চেয়ে বরং স্পষ্ট বল, দাদা মেদিনীপুরে বদলী হয়েচেন, আমি মেয়ে নিয়ে চলে যাই—আমিও জুড়োই, তুমিও বাঁচ!

নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, এ-বেলায় ত হবে না, দেখি যদি ও-বেলায় কিছু যোগাড় করতে পারি।

তার মানে? যোগাড় না করতে পার, উপোস করতে হবে নাকি? দেখ, কালই আমি মেদিনীপুরে যাব। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। এই দালালী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, দাদাকে ধরে একটা চাকরি যোগাড় করে নাও। তাতে বরঞ্চ ভবিষ্যতে থাকবে ভাল; কিন্তু যা পার না; তাতে হাত দিয়ে নিজেও মাটি হ'য়ো না, আমাকেও নষ্ট করো না।

নরেন্দ্র জবাব দিল না। ইন্দু আরও কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু এই সময় বেয়ারাটা শম্ভুবাবুর আগমন-সংবাদ জানাইল, এবং পরক্ষণেই বাহিরে জুতার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দু পার্শ্বের দ্বার দিয়া পর্দ্দার আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুবাবু মহাজন। নরেন্দ্রর পিতা বিস্তর ঋণ করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্রের কাছে তাগাদা করিতে শম্ভুবাবু প্রায়ই শুভাগমন করিয়া থাকেন। আজিও উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মৃদুভাষী। আসন গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে এমন গুটি-কয়েক কথা বলিলেন, যাহা দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্ব্বে অতি-বড় নির্লজ্জও নিজের মাথাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে দ্বিধা করিবেন না। শম্ভুবাবু প্রস্থান করিলে, ইন্দু আর একবার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল ইনি কে?

শম্ভুবাবু।

তার পরে?

কিছু টাকা পাবেন, তাই চাইতে এসেছিলেন।

সে টের পেয়েচি। কিন্তু ধার করেছিলে কেন?

নরেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল। কহিল বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, তাই—

ইন্দু অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল, তোমার বাবা কি পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কাছে দেনা করে গেছেন? এ শোধ করবে কে? তুমি কি করে করবে শুনি?

এতগুলো প্রশ্নের এক নিশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দু নিজেও সে জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল না—তৎক্ষণাৎ কহিল, বেশ ত, তোমার বাবা না হয় হঠাৎ মারা গেছেন, কিন্তু তুমি ত হঠাৎ বিয়ে করনি? বাবাকে এ-সব ব্যাপার তোমার ত জানান উচিত ছিল। আমাকে গোপন করাও ত কর্ত্তব্য হয়নি। লোকের মুখে শুনি, তুমি ভারী ধর্ম-ভীরু লোক, বলি, এ-সব বুঝি তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে না? বলিয়া ঠিক যেন সে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু হায় রে, এতগুলো সুতীক্ষ্ণ বাণ যাহার উপর এমন নিষ্ঠুরভাবে বর্ষিত হইল, ভগবান তাহাকে কি নিরস্ত্র, কি নিরুপায় করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন! কাহাকেও কোন কারণেই প্রতিঘাত করিবার সাধ্যটুকুও তাহার ছিল না, শুধু সাধ্য ছিল সহ্য করিবার। আঘাতের সমস্ত বেদনাই নিজের মধ্যে পাক খাইয়া, অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া যাইত; কিন্তু সেই স্বল্প সময়টুকু আজ তাহার মিলিল না। শম্ভু-বাবুর অত্যুগ্র কথার জ্বালা কণামাত্র শান্ত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দু তাহাতে এমন ভীষণ তীব্র জ্বালা সংযোগ করিয়া দিল যে, তাহারই অসহ্য দহনে আজ সেও প্রত্যুত্তরে একটা কঠোর কথাই বলিতে উদ্যত হইয়া উঠিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। অক্ষমের নিষ্ফল আড়ম্বর মাথা তুলিয়াই ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুধু ক্ষীণস্বরে বলিল, বাবার সম্বন্ধে তোমার কি এমন করে বলা উচিত?

না—উচিত নয়—কিন্তু আমার উচিত-অনুচিতের কথা তোমাকে মীমাংসা করে দিতে ত বলিনি! কেন তোমাদের সমস্ত ব্যাপার বাবাকে খুলে বলনি?

আমি কিছুই গোপন করিনি ইন্দু। তা ছাড়া, তিনি বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজেই সমস্ত জানতেন।

তা হলে বল সমস্ত জেনে-শুনেই বাবা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছেন।

অসহ্য ব্যথায় ও বিস্ময়ে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শির নত করিল। স্ত্রীর এই ক্রোধ যথার্থই সত্য কিংবা কলহের ছলনা মাত্র, হঠাৎ সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না।

এখানে গোড়ার কথা একটু বলা আবশ্যক। এক সময়ে বহুকাল উভয় পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়াছিলেন এবং বিবাহটা সেই সময়েই একরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে ইন্দুর পিতা নিজের মত-পরিবর্ত্তন করিয়া, মেয়েকে একটু অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করায় বিবাহ-সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েক বর্ষ পরে ইন্দুর আঠারো বৎসর বয়সে আবার যখন কথা উঠে, তখন কলিকাতায় ফিরিয়া শুনেন নরেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সময় তাহার সাংসারিক অবস্থা ইন্দুর পিতা-মাতা যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহাদের মত পর্য্যন্ত ছিল না: শুধু বয়স্থা শিক্ষিতা কন্যার প্রবল অনুরাগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।

এত কথা এত শীঘ্র ইন্দু যথার্থই ভুলিয়াছে কিংবা মিথ্যা মোহে অন্ধ হইয়া নিজেকে প্রতারিত করিবার নিদারুণ আত্মগ্লানি এখন এমন করিয়া তাহাকে অহরহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধ-নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

সেই নির্ব্বাক স্বামীর আনত মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্দু আর কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে নিঃশব্দে গেল বটে—এমন অনেকদিন গিয়াছে; কিন্তু আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রর মনে হইল, তাহার বুকে বড় বেদনার স্থানটা ইন্দু যেন ইচ্ছাপূর্বক জোর করিয়া মাড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল! একবার ঈষৎ একটু ঘাড় তুলিয়া স্ত্রীর নিষ্ঠুর পদক্ষেপ চাহিয়া দেখিল; যখন আর দেখা গেল না, তখন গভীর—অতি গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নির্জ্জীবের মত

সেখানেই এলাইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা আজ প্রথম মনে উদয় হইল, সমস্ত মিথ্যা—সব ফাঁকি। এই সংসার, স্ত্রী-কন্যা, স্নেহ-প্রেম—সমস্তই আজ তাঁহার কাছে এক নিমেষে মরুভূমির মরীচিকার মত উবিয়া গেল।

৩

দাদা!

কে রে, বিমল? আয় বোন বোস্! বলিয়া নরেন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। তাহার উভয় ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথার যে চিহ্নটুকু প্রকাশ পাইল, তাহার বিমলার দৃষ্টি এড়াইল না।

অনেকদিন দেখিনি দিদি, ভাল আছিস ত?

বিমলার চোখ-দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বলিল, কেন দাদা তোমার অসুখের কথা আমাকে এতদিন জানাও নি?

অসুখ তেমন তো কিছুই ছিল না বোন, শুধু সেই বুকের ব্যথাটা একটু—

বিমলা হাত দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু বই কি? উঠে বসতে পার না—ডাক্তার কি বললে?

ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে রে, ও আপনি সেরে যাবে।

এঁ্যা! ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকাও নি? ক'দিন হলো?

নরেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল, ক'দিন? এই ত সেদিন রে! দিন-সাতেক বোধ হয়!

সাত দিন! তা হলে বৌ সমস্ত দেখেই গেছে।

না না, দেখে যায়নি বোধ হয়—অসুখ আমার নিশ্চয় সে বুঝতে পারেনি। আমি তার যাবার দিনও উঠে গিয়ে বাইরে বসেছিলুম। না না, হাজার রাগ হোক, তাই কি তোরা পারিস বোন?

বৌ তা হলে রাগ করে গেছে, বল ?

না, রাগ নয়, দুঃখ-কষ্ট—কত অভাব জানিস্ ত ? ওদের এ-সব সহ্য করা অভ্যাস নেই, দেহটাও তার বড় খারাপ হয়েছে, নইলে অসুখ দেখলে কি তোরা রাগ করে থাকতে পারিস্ ?

বিমলা অশ্রু চাপিয়া কঠিন-স্বরে বলিল, পারি বই কি দাদা, আমাদের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। না হলে, তোমরা বিছানায় না শোয়া পর্য্যন্ত আর আমাদের চোখে পড়ে না ! ভোলা, পাল্‌কি এলো রে ?

আনতে পাঠিয়েচি মা।

এর মধ্যেই যাবি দিদি ? এখনো ত সন্ধ্যে হয়নি, আর একটু বোস্ না ?

না দাদা, সন্ধ্যে হলে হিম লাগবে ! ভোলা, পাল্‌কি একেবারে ভেতরে আনিস।

ভেতরে কেন বিমল ?

ভেতরেই ভাল দাদা। এই ব্যথা নিয়ে তোমার বাইরে গিয়ে উঠতে কষ্ট হবে।

আমাকে নিয়ে যাবি ? এই পাগল দেখ ! কি হয়েছে যে এত কাণ্ড করতে হবে ? এ ত আমার প্রায়ই হয়। প্রায়ই সেরে যায়।

তাই যাক দাদা। কিন্তু 'ভাই' ত আমার আর নেই যে, তোমাকে হারালে আর একটি পাব। ঐ যে পাল্‌কি—এই র‍্যাপারখানা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ো। ভোলা, আর একটু এগিয়ে আনতে বল—না দাদা, এ-সময় তোমাকে চোখে-চোখে না রাখতে পারলে আমার তিলার্দ্ধ স্বস্তি থাকবে না।

কিন্তু, নিয়ে যেতে চাইবি বুঝলে যে তোকে আমি খবরই দিতুম না।

বিমলা মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমাদের বোঝা তোমাদেরই থাক্ দাদা, আমাকে আর শুনিয়ো না। আচ্ছা, কি করে মুখে আনলে বল ত ? এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে পারি ? সত্যি কথা বল .

নরেন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে চল্ যাই।

দাদা?

কি রে?

আজ রাত্রেই বৌকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, কাল সকালেই চলে আসুক।

নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—না, না সে দরকার নেই।

কেন নেই? মেদিনীপুর ত বেশী দূর নয়, একবার আসুক, না হয় আবার চলে যাবে।

না রে বিমল, না। সত্যিই তার দেহটা ভাল নেই—দু'দিন জুড়োক।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বিমল, আমি তোর কাছ থেকে ভাল না হতে পারি ত আর কিছুতেই পারব না। হাঁ রে, আমি যে যাচ্ছি, গগনবাবু শুনেচেন?

বেশ যা হোক তুমি! তিনি ত এখনো অফিস থেকেই ফেরেন নি।

তবে?

তবে আবার কি? তোমার ভয় নেই দাদা, তাঁর বেশ বড় বড় দুটো চোখ আছে, আমরা গেলেই দেখতে পাবেন।

নরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কহিল, বিমল, আমার যাওয়া ত হতে পারে না।

বিমলা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

গগনবাবুর অমতে—

অমন করলে মাথা খুঁড়ে মরব দাদা! একটা বাড়ির মধ্যে কি ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে যে, আমাকে অপমান করচ?

অপমান করচি! ঠিক জানিস্ বিমল, ভিন্ন মত থাকে না?

বিমলা আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতেছিল, সলজ্জে মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

দাদা, আজ ব্যথাটা টের পাচ্ছ না, না ?

একেবারে না। আটদিন তোদের কি কষ্টই না দিলুম—এখন বিদেয় কর দিদি।

করব কার কাছে ? আচ্ছা দাদা, এই ষোল-সতের দিনের মধ্যে বৌ একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিলে না ?

বা, দিয়েচেন বই কি। পৌঁছান-সংবাদ দিয়েছিলেন, কালও একখানা পেয়েছি—বরং আমিই জবাব দিতে পারিনি ভাই।

বিমলা মুখ ভার করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, সেখানে গিয়ে পর্য্যন্ত সে ভাল নেই—সর্দ্দি-কাসি,—পরশু একটু জ্বরের মত হয়েছিল, তবু তার ওপরেই চিঠি লিখেচেন।

আজ তাই বুঝি সেখানে টাকা পাঠিয়ে দিলে ?

নরেন্দ্র অধিকতর লজ্জিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিছুই ত তার হাতে ছিল না—বাড়ির পাশেই একটা মেলা বসেচে,—লিখেচেন, সেটা শেষ হয়ে গেলেই ফিরতে পারবেন—তোমাকে বুঝি চিঠিপত্র লিখতে পারেন নি ?

পেরেচেন বই কি ? কাল আমিও একখানা চারপাতা-জোড়া চিঠি পেয়েচি—

পেয়েচিস্ ? পাবি বই কি—তার জবাবটা—

তোমার ভয় নেই দাদা—তোমার অসুখের কথা লিখবো না। আমার নষ্ট করবার মত অত সময় নেই। বলিয়া বিমলা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা জানালার ভিতর দিয়া লাল আকাশের পানে চাহিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল, বিমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চুপ করে কি ভাবচ দাদা ?

নরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া বলিল, কিছুই ভাবি নে বোন, মনে মনে তোকে আশীর্বাদ করছিলুম, যেন এমনি সুখেই তোর চিরদিন কাটে।

বিমলা কাছে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া একটা চৌকির উপর বসিল।

আচ্ছা, দুপুরবেলা অত রাগ করে চলে গেলি কেন বল্ ত ?

আমি অন্যায় সইতে পারি নে ? কেন তুমি অত—

অত কি বল্ ? ইন্দুর দিক থেকে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি ? আমি ত তাকে সুখে রাখতে পারিনি ?

সুখে থাকতে পারার ক্ষমতা থাকা চাই দাদা ! সে যা পেয়েচে, এত কজন পায় ? কিন্তু সৌভাগ্যকে মাথায় তুলে নিতে হয় ; নইলে— কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই বিমলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

নরেন্দ্র নীরবে স্নিগ্ধ-সস্নেহ দৃষ্টিতে এই ভগিনীটির সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিয়া, ক্ষণকাল পরে কহিল, বিমলা, লজ্জা করিস্ নে দিদি, সত্য বল্ ত, তুই কখনো ঝগড়া করিস নে ?

উনি বলেচেন বুঝি ? তা ত বলবেনই।

নরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, না, গগনবাবু কিছু বলেননি—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি।

বিমলা আরক্ত মুখ তুলিয়া বলিল, তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কে পারবে বল ? শেষে হাতে-পায়ে পড়ে—ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?

আমি, আমি—গগনবাবু। থামলে কেন—বলে যাও। ঝগড়া করে কার হাতে-পায়ে কাকে পড়তে হয়—কথাটা শেষ করে ফেল।

যাও—যে সাধু-পুরুষ লুকিয়ে শোনে, তার কথার আমি জবাব দিই নে। বলিয়া, বিমলা কৃত্রিম ক্রোধের আড়ালে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

নরেন্দ্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মোটা তাকিয়াটা হেলান দিয়া বসিল। গগনবাবু বলিলেন, এ-বেলায় কেমন আছ হে ?

ভাল হয়ে গেছি। এবার বিদায় দাও ভাই।

বিদায় দাও ? ব্যস্ত হয়ো না হে—দু'দিন থাকো। তোমার এই

কেনটর আশ্রয়ে যে ক'টা দিন বাস করতে পায়, তার তত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে খবর জানো ?

জানি নে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

গগনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করি কি হে. এ যে প্রমাণ করা কথা! বাস্তবিক নরেনবাবু, এমন বস্তুও সংসারে পাওয়া যায়! ভাগ্য! ভাগ্য! ভাগ্যং ফলতি—কি হে কথাটা? নইলে আমার মত হতভাগ্য যে এ বস্তু পায়, এ ত স্বপ্নের অগোচর: বৌঠাকরুণ—না হে না, থেকে যাও দু'দিন—এমন সংসার ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আরাম পাবে না তা বলে দিচ্ছি ভাই।

বিমলা বহু দূরে যায় নাই, ঠিক পর্দার আড়ালেই কান পাতিয়াছিল —চোখ মুছিয়া উঁকি মারিয়া সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার স্বামীর কথাগুলো শুনিয়া নরেন্দ্রের মুখখানা একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন ছাই হইয়া গেল।

৪

দিন-পনের পরে দুপুরের গাড়িতে ইন্দু মেয়ে লইয়া মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী ও কন্যাকে সুস্থ সবল দেখিয়া নরেন্দ্রর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে ঘুমন্ত কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, কেমন আছ ইন্দু?

বেশ আছি। কেন?

তোমার জ্বরের মতন হয়েছিল শুনে ভারি ভাবনা হয়েছিল। সেরে গেছে?

না হলে ডাক্তার ডাকবে না কি?

নরেন্দ্রর হাসিমুখ মলিন হইল। কহিল, না, তাই জিজ্ঞাসা করচি. কি হবে করে? এদিকে ত পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে চিঠির ওপর

চিঠি যাচ্ছিল—কেমন আছ—কেমন আছ—সাবধানে থেকো, সাবধানে থেকো। আমি কি কচি খুকি, না, পঞ্চাশটি টাকা দাদা আমাকে দিতে পারতেন না? ও টাকা পাঠিয়ে সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দেবার কি দরকার ছিল? সেদিন বাড়িতে যেন একটা হাসি পড়ে গেল।

নরেন্দ্র ম্লান মুখ আরও ম্লান করিয়া অস্ফুটে কহিল, আর যোগাড় করতে পারলুম না।

না পাঠিয়ে তাই কেন লিখে দিলে না? উঃ—আবার সেই নিত্য নেই নেই—দাও দাও—বেশ ছিলুম এতদিন। বাস্তবিক বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে পড়ার মত মহাপাপ আর সংসারে নেই, বলিয়া এই পরম সত্যে স্বামীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া ইন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

মাসাধিক পরে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

বাহিরে আসিয়া ইন্দু ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া, নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া দেখিল, বাড়ির অন্যান্য স্থানের মত এখানেও সমস্ত বস্তু রীতিমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, এত ঝাড়া-মোছা হচ্ছে কেন রে?

নূতন ঝি বলিল, আপনি আসবেন বলে।

আমি আসব বলে?

হ্যাঁ মা, বাবু তাই ত বলে দিলেন। আপনি ময়লা কিছু দেখতে পারেন না—আজ তিন দিন থেকে তাই—

ইন্দু অন্তরের মধ্যে একটা বড় রকমের গর্ব অনুভব করিল। কিন্তু সহজভাবে বলিল, ময়লা কে দেখতে পারে? বাবু ভাল যে—

হ্যাঁ মা, লোক লাগিয়ে ওপর-নীচে সমস্ত সাফ করা হয়েচে।

ঝি, রামটহলটাকে একবার ডেকে দাও ত, বাজার থেকে কিছু ফলমূল কিনে আনুক।

ফলটল ত সব আছে মা। বাবু আজ সকালে নিজে বাজারে গিয়ে সমস্ত খুঁটিয়ে কিনে এনেচেন।

ডাব আছে? আঙুর?

আছে বই কি। এখনি নিয়ে আসচি, দাসী চলিয়া গেল। ইন্দুর মুখের উপর হইতে বিরক্তির মেঘখানা সম্পূর্ণ উড়িয়া গেল। বরং অনতিপূর্বে স্বামীর মলিন মুখখানা বুকের কোথায় যেন একটু খচ্‌খচ করিতেও লাগিল।

বিশ্রাম করিয়া ঘণ্টা-দুই পরে সে প্রসন্নমুখে বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নরেন্দ্র চশমা খুলিয়া ঝুঁকিয়া বসিয়া কি লিখিতেছে। কহিল, অত মন দিয়ে কি লেখা হচ্ছে, কবিতা?

নরেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কি তবে?

ও কিছু না, বলিয়া সে লেখাগুলো চাপা দিয়া রাখিল।

ইন্দুর প্রসন্ন মুখ মেঘাবৃত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হলে 'কিছু না'র উপর অত ঝুঁকে না পড়ে বরং যাতে দুঃখ-কষ্ট ঘোচে এমন কিছুতেই মন দাও। শুনলুম, দাদার হাতে নাকি গোটাকতক চাকরী খালি আছে। বলিয়া ভাল করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, এই চাকুরী কথাটা তাহাকে চিরদিন আঘাত করে। আজ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, আঘাতের কোন বেদনাই তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

নরেন্দ্র শান্তভাবে বলিল, চাকরি করবার লোকও সেখানে আছে।

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে ইন্দু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, তা জানি। কিন্তু সেখানে আছে, এখানে নেই নাকি? আজকাল ভাল কথা বললে যে তোমার মন্দ হয় দেখচি! ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে বসে কবিতা লিখতে তোমার লজ্জা করে না? বলিয়া সে চোখ-মুখ রাঙা করিয়া ঘর ছাড়িয়া গেল। এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

অ্যাঁ—এ যে বৌ! কখন এলে!

পরশু দুপুরবেলা।

পরশু—দুপুরবেলা! তাই এত তাড়াতাড়ি আজ সন্ধ্যাবেলায় দেখা দিতে এসেচ? না ভাই বৌ, টানটা একটু কম করো।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, চিঠি লিখে জবাব পর্য্যন্ত পাই নে। আমি একা আর কত টানব ঠাকুরঝি?

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, জবাব পাওনি?

সে না পাওয়াই। চার পাতার জবাব চার ছত্র ত?

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তখন এতটুকু সময় ছিল না ভাই। এ ঘরে দাদা যদি বা একটু সারলেন, ওদিকে আমার নতুন ভাড়াটে যায় যায়।

ইন্দু কথাটার একবর্ণও বুঝিল না, হাঁ করিয়া রহিল।

বিমলা সে দিকে মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল, সেই মঙ্গলবারটা আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। সাতদিনের দিন খবর পেয়ে দাদাকে নিয়ে এলুম, তার দু'দিন পরে দাদার বুকের ব্যথার যেমন বাড়াবাড়ি, অম্বিকাবাবুর অসুখটাও তেমনি বেড়ে উঠল—তোমাকে বলব কি বৌ, সেঁক দিতে দিতে আর ফোমেণ্ট করতে করতে বাড়িশুদ্ধ লোকের হাতের চামড়া উঠে গেল—সারা দিন-রাত কারু নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত হ'লো না হাঁ, সতী-সাধ্বী বলি ওই অম্বিকাবাবুর স্ত্রীকে। ছেলেমানুষ বৌ কিন্তু কি যত্ন, কি স্বামী-সেবা তার পুণ্যেই এ-যাত্রা তিনি রক্ষে পেয়ে গেলেন—নইলে ডাক্তার-বদ্যির সাধ্য ছিল না।

অম্বিকাবাবু কে?

কি জানি, ঘাটালের কাছে কোথায় বাড়ি। চিকিৎসার জন্য এখানে এসে আমাদের ঐ পাশের বাড়িটা নিয়েছেন। লোকজন নেই, পয়সা কড়িও নেই,—শুধু বৌটি—

ইন্দু মাঝখানেই প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার বুঝি খুব বেড়েছিল?

বিমলা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল, সে-রাতে আমার ত সত্যিই ভয় হয়েছিল। ঐ তাকের ওপর ওষুধের খালি শিশিগুলো চেয়ে

দেখ না—তিনজন ডাক্তার—আর, আচ্ছা, বৌ, দাদা বুঝি এ-সব কথা তোমাকে চিঠিতে লেখেনি।

ইন্দু অন্যমনস্কের মত কহিল, না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এসে বুঝি শুনলে?

ইন্দু তেমনিভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ।

বিমলা বলিতে লাগিল, আমি ত তোমাকে প্রথম দিনেই টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলুম। মাত্র দু-তিন ঘণ্টার পথ স্বচ্ছন্দে আসতে পারতে, কিন্তু দাদা কিছুতেই দিলেন না। হাসিয়া কহিল, কি যে তাকে তুমি করেচ, তা তুমিই জান বৌ, পাছে অসুস্থ শরীরে তুমি ব্যস্ত হও, এই ভয়ে কোনমতেই খবর দিতে চাইলেন না। যাক—ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল হয়ে গেছে—নইলে—

নইলে তার কি হ'তো ঠাকুরঝি? অসুখ সারতেও আমাকে দরকার হয়নি, না সারলেও হয়ত দরকার হ'তো না। বলিয়া ইন্দু উঠিয়া গিয়া, ঔষধের শূন্য এবং অর্দ্ধশূন্য শিশিগুলো নাড়িয়া-চাড়িয়া লেবেলের লেখা পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এ কি হইল? কখনও যাহা হয় নাই—আজ অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপ্সা হইয়া গেল। কেন, সে কি কেহ নয় যে, এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ তাহাকে জানানো পর্য্যন্ত হইল না। সে নিজের এমন কি পীড়ার কথা লিখিয়াছিল যাহাতে সংবাদ দেওয়াটাও কেহ উচিত মনে করিলেন না!

তিনি ভাল হইয়াও ত কতকগুলো পত্রে কত কথা লিখলেন, শুধু নিজের কথাটাই বলিতে ভুলিলেন? বেশ, এখানে আসিয়াও ত তিন দিন হইল, তবু কি মনে পড়িল না?

ইন্দুর তীব্র অভিমানের সুর বিমলা টের পাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শিশিবোতল নাড়াচাড়া করে আর কি হবে বৌ, ওরা কখনও মিথ্যে সাক্ষী দেবে না, যতই জেরা কর না! এসো, তোমার চা দেওয়া হয়েচে।

চল, বলিয়া ইন্দু অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে, বিমলা কি জানি ইচ্ছা করিয়া আঘাত দিল কি না—কহিল, সে এক হাসির কথা বৌ। এক বাড়িতে দুই রোগী, কিন্তু দুজনের কি আশ্চর্য ভিন্ন ব্যবস্থা। দাদা মর মর হয়েও তোমাকে খবর দিতে দিলেন না; পাছে ব্যস্ত হও—পাছে তোমার শরীর খারাপ হয়—আর অম্বিকাবাবু একদণ্ড ওর স্ত্রীকে সুমুখ থেকে নড়তে দিলেন না! তাঁর ভয়, সে চোখের সুমুখ থেকে গেলেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে! এমন কি, সে ছাড়া তিনি কারও হাতে বিশ্বাস করে ওষুধ খেতেন না—এমন কখন শুনেচ বৌ? আমাদের এঁকে তোমরা সবাই তামাশা কর, কিন্তু অম্বিকাবাবু সকলকে ডিঙিয়ে গেছেন; খেটে খেটে এই মেয়েটির ঠিক মড়ার মত আকৃতি হয়েচে।

হুঁ বলিয়া ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আর একদিন এসে তোমার সতী-সাধ্বী বৌটির সঙ্গে আলাপ করে যাব—আজ গাড়ি এসেচে, চললুম।

তা হলে কাল একবার এস। আলাপ করে বাস্তবিক সুখী হবে।

দেখা যাবে যদি কিছু শিখতে পারি, বলিয়া ইন্দু মুখ ভার করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল। অম্বিকাবাবুর পাগলামি তাহার মনের মধ্যে আজ সমস্ত পথটা তাহার স্বামীর গভীর মঙ্গলেচ্ছার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া লজ্জা দিতে চলিল।

৫

দিন-দুই পরে কথায় কথায় ইন্দু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যদি সত্যি কথা শুনলে রাগ না কর, তা হলে বলি ঠাকুরঝি, বিয়ে করা তোমার দাদার উচিত হয়নি, এই অম্বিকাবাবুরও হয়নি।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল কেন ?

কারণ, প্রতিপালন করবার ক্ষমতা না থাকলে এটা মহাপাপ !

উত্তর শুনিয়া বিমলা মর্মাহত হইল। ইন্দুকে সে ভালবাসিত। খানিকক্ষণ পরে কহিল, অম্বিকাবাবুর অন্যায় থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার স্ত্রী নিজের কর্ত্তব্য করবে না ? তাকে ত মরণ পর্য্যন্ত স্বামী-সেবা করতে হবে ?

কেন হবে ? তিনি অন্যায় করবেন, যাতে অধিকার নেই তাই করবেন—তার ফলভোগ করবো আমরা ? তুমি ইংরিজি পড়নি, আর পাঁচটা সভ্য-সমাজের খবর রাখ না ; নইলে বুঝিয়ে দিতে পারতুম, কর্ত্তব্য শুধু একদিকে থাকে না। হয় দু'দিকে থাকবে, না হয় থাকবে না। পুরুষেরা একথা আমাদের বুঝতে দেয় না ; দেয় না বলেই আমরা অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর মত মৃত্যুপণ করে সেবা করি।

বিমলা মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, না হলে করতাম না বৌ, সেবা করাটা কি স্ত্রীর বড় দুঃখের কাজ বলে মনে কর ? অম্বিকা-বাবু স্ত্রীর বাইরের ক্লেশটাই দেখতে পাও, আর ভেতরের আনন্দটা জানতে পাও কি ?

আমি জানতেও চাই নে।

স্বামীর ভালবাসাটাও বোধ করি জানতে চাও না ?

না ঠাকুরঝি, অরুচি হয়ে গেছে। বরং ওটা কম করে নিজের কর্ত্তব্যটা করলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বিমলা দাঁড়াইয়াছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ঠিক এই কথাটা আগেও একবার বলেচ। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও বুঝতে পারলুম না ; আমার দাদা তার কর্ত্তব্য করেন না। কি সে, তা তুমিইই জানো। অনেক বই পড়েচ, অনেক দেশের খবর জানো—তোমার সঙ্গে তর্ক করা সাজে না ; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বামী ন্যায়-অন্যায় যাই করুন, তার ভালবাসা অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা কোন দেশের স্ত্রীর নেই। আমার ত মনে হয়, ও জিনিস

হারানোর চেয়ে মরণ ভাল ; তার পরেও বেঁচে থাকা শুধু বিড়ম্বনা।

আমি তা মানি নে।

মানো নিশ্চয়ই, বলিয়া বিমলা হাসিয়া ফেলিল। তাহার সহসা মনে হইল, এ সমস্তই পরিহাস। সত্যই ত পরিহাস ভিন্ন নারীর মুখে ইহা আর কি হইতে পারে! কহিল, কিন্তু তাও বলি বৌ, আমার কাছে যা মুখে আসে বলছ, কিন্তু দাদার সামনে এ-সব নিয়ে বেশী চালাকি করো না। কেননা পুরুষমানুষ যতই বুদ্ধিমান হোন, অনেক সময়ে—

কি—অনেক সময়ে ?

তামাশা কি না, ধরতে পারে না।

সে তার কাজ। আমি তা নিয়ে দুর্ভাবনা করি নে।

কিন্তু আমি যে না ভেবে থাকতে পারি নে বৌ!

ইন্দু জোর করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কেন বল ত ?

বিমলা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, রাগ ক'রো না বৌ ; কিন্তু সেই অসুখের সময় আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, দাদা যে তোমাকে পাবার জন্য একসময় পাগল হয়ে উঠেছিল, সেই যে কি বলে 'পায়ে কাঁটা ফুটলে বুক পেতে দেওয়া—কিন্তু, সে-ভাব আর বুঝি নেই।

হঠাৎ ইন্দুর সমস্ত মুখের উপর কে যেন কালি লেপিয়া দিল : তার পরে, সে জোর করিয়া শুক্‌নো হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ ঠাকুরঝি, তোমার দাদাকে ব'লো, আমি ভ্রূক্ষেপও করি নে। আর তুমিও ভাল করে বুঝো, আমার নিজের ভালমন্দ নিজেই সামলাতে জানি। তা নিয়ে পরের মাথা গরম করাটাও আবশ্যক মনে করি নে।

ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু স্বামীর ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিল, আমি মেদিনীপুরে গেলে তোমার ব্যামো হয়েছিল ?

নরেন্দ্র খাতা হইতে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, ব্যামো নয় —সেই ব্যথাটা।

খরচ বাঁচাবার জন্যে ঠাকুরঝির ওখানে গিয়ে পড়েছিলে ?

স্ত্রীর এই অত্যন্ত কটু ইঙ্গিতে নরেন্দ্র খাতাটার উপর পুনর্বার ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বিমলা এসে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি শুনতে পেলে বলে দিতাম, অক্ষমদের জন্য হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েচে। পরের ঘাড়ে না চড়ে সেইখানে যাওয়াই তাদের উচিত।

নরেন্দ্র আর মুখ তুলিল না—একটি কথাও কহিল না।

ইন্দু টান মারিয়া পর্দ্দাটা সরাইয়া বাহির হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিয়া একটা ক্ষুদ্র টিপাই ফুলদানি-সমেত উল্টাইয়া পড়িল; সে ফিরিয়াও চাহিল না।

মিনিট-পাঁচেক পরে, তেমনি সজোরে পর্দা সরাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ঠাকুরঝি খবর দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মানা করেছিলে কি জন্যে? ভেবেছিলে বুঝি আমি এসে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেব?

নরেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই বলিল, না, তা ভাবিনি। তোমার শরীর ভাল ছিল না—

ভালই ছিল। যদিও খবর পেয়েও আমি আসতুম না, সে নিশ্চয় কিন্তু আমি সেখানে যে রোগে মরে যাচ্ছিলাম, এ-কথাও তোমাকে চিঠিতে লিখিনি। অনর্থক কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে ঠাকুরঝিকে নিষেধ করার হেতু ছিল না। বলিয়া সে যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্র তেমনি করিয়া খাতাটার পানে ঝুঁকিয়া রহিল, কিন্তু সমস্ত লেখা তাহার লেপিয়া মুছিয়া চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া গেল।

ইন্দু পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারকে কহিল, আপনিই গগনবাবুর বাড়িতে আমার স্বামীর চিকিৎসা করেছিলেন?

বুড়া ডাক্তার চোখ তুলিয়া ইন্দুর উদ্বেগ-মলিন মুখখানির পানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

ইন্দু কহিল, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছেন বলে আমার মনে হয়

না! এই আপনার ফি-র টাকা—আজ একবার ওবেলা যদি দয়া করে বন্ধুভাবে এসে তাঁকে দেখে যান, বড় উপকার হয়।

ডাক্তার কিছু বিস্মিত হইলেন।

ইন্দু বুঝাইয়া বলিল, ওঁর স্বভাব চিকিৎসা করতে চান না। ওষুধের প্রেসক্রিপসনটা আমাকে লুকিয়ে দেবেন। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

ডাক্তার সম্মত হইয়া বিদায় লইলেন।

রামটহল আসিয়া সংবাদ দিল, মাজী, বল্লভ স্যাকরা এসেচে।

এসেচে? এদিকে ডেকে আনো।

ও বল্লভ, একটু কাজের জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তুমি আমাদের বিশ্বাসী লোক—এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রি করে দিতে হবে, বড় পুরানো ধরনের চুড়ি বাপু, আর পরা যায় না। এ দামে নতুন এক-জোড়া কিনবো মনে কচ্চি।

বেশ ত মা, বিক্রি করে দেব।

নিক্তি এনেচ ত? ওজন করে দেখ দেখি কত আছে? দামটা কিন্তু বাপু আমাকে কালই দিতে হবে। আমার দেরি হলে চলবে না।

তাই দেব।

বল্লভ চুড়ি হাতে করিয়া বলিল, এ যে একেবারে টাটকা জিনিস মা! বেচলেই ত কিছু লোকসান হবে।

তা হোক বল্লভ। এ গড়নটা আমার মনে ধরে না। আর দেখ, এ-সম্বন্ধে বাবুকে কোনও কথা ব'লো না।

বাবুদের লুকাইয়া অলঙ্কার বেচা-কেনার ইতিহাস বল্লভের অবিদিত ছিল না। একটু হাসিয়া চুড়ি লইয়া গেল।

৬

ডাক্তারবাবু, পাঁচ-সাত শিশি ওষুধ খেলেন, কিন্তু বুকের ব্যথাটা ত গেল না।

গেল না? কই, তিনি তা কিছু বলেন না?

জানেন ত, ঐ তাঁর স্বভাব; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, একটু ব্যথা লেগেই আছে—তা ছাড়া শরীর ত সারচে না।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখুন আমারও সন্দেহ হয়, শুধু ওষুধে কিছু হবে না। একবার জল-হাওয়া পরিবর্তন আবশ্যক।

তাই কেন তাঁকে বলেন না?

বলেছিলাম একদিন। তিনি কিন্তু প্রয়োজন মনে করেন না।

ইন্দু রুষ্ট হইয়া বলিয়া ফেলিল, তিনি মনে না করলেই হবে? আপনি ডাক্তার, আপনি যা বলবেন তাই ত হওয়া উচিত।

বৃদ্ধ চিকিৎসক একটু হাসিলেন।

ইন্দু নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া বলিল, দেখুন, আমি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েচি, আপনি ওঁকে খুব ভয় দেখিয়ে দিন।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, এ-সকল রোগে ভয় ত আছেই।

ইন্দুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিল, সত্যি ভয় আছে?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তার সহসা জবাব দিতে পারিলেন না।

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল; বলিল, আমি আপনার মেয়ের মত ডাক্তারবাবু, আমাকে লুকোবেন না। কি হয়েছে, খুলে বলুন।

ঠিক যে কি হইয়াছে তাহা ডাক্তার নিজেও জানিতেন না। তিনি নানা রকম করিয়া যাহা কহিলেন, তাহাতে ইন্দুর ভয় ঘুচিল না। সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকেলবেলা নরেন্দ্র হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া খোলা জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। নরেন্দ্র একবার মুখ ফিরাইয়া আবার সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে ইন্দু টাকা চাহে নাই, আজ সে কিসের জন্যে আসিয়া বসিল, তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করিতে লাগিল।

ইন্দু টাকা চাহিল না; কহিল, ডাক্তারবাবু বললেন, ব্যথাটা যখন ওষুধে যাচ্ছে না, তখন হাওয়া বদলানো দরকার। একবার কেন বেড়াতে যাও না।

নরেন্দ্র বাস্তবিকই চমকিয়া উঠিল। বহুদিন অজ্ঞাত বড় স্নেহের ধন যেন কোথায় লুকাইয়া তাহাকে ডাক দিল। ইন্দুর এই কণ্ঠস্বর সে ত ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই মুখ ফিরাইয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য কি যেন মনে মনে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

ইন্দু কহিল, কি বল? তা হলে কালই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। বেশি দূরে কাজ নেই—এই বদ্যিনাথের কাছে—আমরা দু'জন কমলা আর ঝি—রামটহল পুরানো বিশ্বাসী লোক, বাড়িতেই থাক। সেখানে একটা ছোট বাড়ি নিলেই হবে। তাহলে আজ থেকেই গুছোতে আরম্ভ করুক না কেন?

কোন প্রকার খরচের কথাতেই নরেন্দ্র ভয় পাইত! এই একটা বড় রকমের ইঙ্গিতে তাহার মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। প্রশ্ন করিল, এই ডাক্তারটিকে আসতে বললে কে?

ইন্দু জবাব দিবার পূর্বেই সে পুনরায় কহিল, বিমলাকে বোলো আমার পিছনে ডাক্তার লাগিয়ে উত্যক্ত করবার আবশ্যক নেই, আমি ভাল আছি।

বিমলা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ডাক্তার পাঠাইতেছে,—বিমলাই সব। ইন্দু অন্তরে আঘাত পাইল। তবু চাপা দিয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত সত্যই ভাল নেই! ব্যথাটা ত সারেনি।

সেরেচে।

তাহলেও শরীর সারেনি—বেশ দেখতে পাচ্ছি। একবার ঘুরে এলে আর যাই হোক—মন্দ কিছু ত হবে না।

নরেন্দ্র ভিতরে-বাহিরে এমন জায়গায় উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে সহ্য করিবার ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তবুও ধাক্কা সামলাইয়া বলিল, আমার ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য নেই।

ইন্দু জিদ করিয়া বলিল, সে হবে না। প্রাণটা ত বাঁচানো চাই।

এই জিদটা ইন্দুর পক্ষে এতই নূতন যে, নরেন্দ্র সম্পূর্ণ ভুল করিল। তাহার নিশ্চয়ই মনে হইল, তাহাকে ক্লেশ দিবার ইহা একটা অভিনব কৌশল মাত্র। এতদিনের ধৈর্যের বাঁধন তাহার নিমেষে ছিন্ন হইয়া গেল। চেঁচাইয়া উঠিল, কে বললে প্রাণ বাঁচানো চাই? না, চাই না। তোমার পায়ে পড়ি ইন্দু, আমাকে রেহাই দাও, আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

স্বামীর কাছে কটু কথা শোনা ইন্দু কল্পনা করিতেও পারিত না। সে কেমন যেন জড়সড় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র জানিতে পারিল না; বলিতে লাগিল, তুমি ঠিক জানো, আমি কি সঙ্কটের মাঝখানে দিন কাটাচ্ছি। সমস্ত জেনে-শুনেও আমাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্যেই অহর্নিশি খোঁচাচ্চ। কেন, কি করেচি তোমার? কি চাও তুমি?

ইন্দু ভয়ে বিবর্ণ হইয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চেঁচামেচি উত্তেজনা নরেন্দ্রের পক্ষে যে কিরূপ অস্বাভাবিক, তাহা এইবার সে নিজেই টের পাইল। কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, বেশ, স্বীকার করলুম আমার হাওয়া বদলানো আবশ্যক, কিন্তু কি করে যাব? কোথায় টাকা পাব? সংসার-খরচ যোগাতেই যে আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে।

ইন্দু নিজে কোনও দিন ধৈর্য শিক্ষা করে নাই; অবনত হইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। আজ কিন্তু সে ভয় পাইয়াছিল। নম্র-কণ্ঠে কহিল, টাকা নেই বটে, কিন্তু অনেক টাকার গয়না ত আমাদের আছে—

আছে, কিন্তু আমাদের নেই, তোমার আছে। তোমার বাবা দিয়েচেন তোমাকে। আমার তাতে একবিন্দুও অধিকার নেই—এ কথা আমার চেয়ে তুমি নিজেই ঢের বেশী জানো।

বেশ, তা না নাও—আমি নগদ টাকা দিচ্ছি।

কোথায় পেলে? সংসার-খরচ থেকে বাঁচিয়েচ?

ইহা চুড়ি বিক্রয় টাকা। ইন্দু সহজে মিথ্যা কথা কহিতে পারিত না। ইহাতে তাহার বড় অপমান বোধ হইত। আজ কিন্তু সে মিথ্যা বলিল। নরেন্দ্রের মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন হইল। ধীরে ধীরে বলিল, রেখে দাও, গয়না গড়িয়ো। আমার বুকের রক্ত জল করে যা জমা হয়েচে, তা এভাবে নষ্ট হতে পারে না। ইন্দু, কখনও তোমাকে কটু কথা বলিনি, চিরদিন শুনেই আসচি। কিন্তু তুমি না সেদিন দম্ভ করে বলেছিলে, কখনও মিথ্যা কথা বলো না? ছিঃ—

কমলা পর্দা ফাঁক করিয়া ডাকিল, মা, পিসীমা এসেচেন।

কি হচ্ছি গো বৌ? বলিয়া বিমলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু মেয়েকে আনিয়া, তাহার গলার হারটা দুই হাতে সজোরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্বামীর মুখের সামনে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, মিথ্যে বলতে আমি জানতাম না—তোমার কাছেই শিখেচি। তবু এখনও পেতলকে সোনা বলে চালাতে শিখিনি। যে স্ত্রীকে ঠকায়, নিজের মেয়েকে ঠকায়, তার আর কি বাকী থাকে! সে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে কি করে?

নরেন্দ্র ছিন্ন হারটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলে পেতল? যাচাই করিয়েচ?

তোমার বোনকে যাচাই করে দেখতে বল। বলিয়াই সে দুই চোখ রাঙা করিয়া বিমলার দিকে চাহিল।

বিমলা দু'পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, ও কাজ আমার নয় বৌ, আমি এত ইতর নই যে, দাদার দেওয়া গয়না স্যাকরা ডেকে যাচাই করে দেখব।

নরেন্দ্র কহিল, ইন্দু, তোমাকেও দু-একখানা গয়না দিয়েচি, সেগুলো যাচাই করে দেখেচ?

দেখিনি, কিন্তু এবার দেখাতে হবে।

দেখো, সেগুলো পেতল নয়।

ভগিনীর মুখের পানে চাহিয়া হারটা দেখাইয়া কহিল, এটা সোনা নয় বোন, পেতলই বটে। যে দুঃখে বাপ হয়ে ঐ একটি মেয়ের জন্মদিনে তাকে ঠকিয়েছি, সে তুই বুঝবি। তবুও মেয়েকে ঠকাতে পেরেচি, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ঠকাতে সাহস করিনি।

৭

কথা শোন বৌ, একবার পায়ে হাত দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও গে।

কেন, কি দুঃখে? আমার মাথা কেটে ফেললেও আমি তা পারব না ঠাকুরঝি।

কেন পারবে না? স্বামীর পায়ে হাত দিতে লজ্জা কি? বেশ ত তোমার দোষ না হয় নেই, কিন্তু তাঁকে প্রসন্ন করা যে সকল কাজের বড়।

না—আমার তা নয়। ভগবানের কাছে খাঁটি থাকাই আমার সকল কাজের বড়। যতক্ষণ সে অপরাধ না করচি, ততক্ষণ আর কিছুই ভয় করি নে।

বিমলা রাগিয়া বলিল, বৌ, এ-সব পাকামির কথা আমরাও জানি তখন কিছুই কোন কাজে আসবে না বলে দিচ্চি। চোখ বুজে বিপদ এড়ানো যায় না। দাদা সত্যই তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছেন।

ইন্দু উদাসভাবে বলিল, তাঁর ইচ্ছে!

বিমলা মনে মনে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই ইচ্ছে টের পাবে, যেদিন সর্বনাশ হবে। দাদা যেমন নিরীহ, তেমনি কঠিন। তাঁর এ-দিক দেখেচ, ও-দিক দেখতে এখনো বাকী আছে—তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা, দেখতে পেলে তোমাকে খবর দিয়ে আসব।

বিমলা আর কিছু বলিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা সত্য। বিশ্বাস হয় না বটে, স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হবো। কিন্তু সে মানুষ যে দাদা নয়—অসুখের সময় তাঁকে ভাল করে চিনেচি। বুকের কপাট তাঁর একবার বন্ধ হয়ে গেলে আর খোলা যাবে না।

এইবার ইন্দুও মুখ গম্ভীর করিল। কহিল, খোলা না পাই, বাইরেই থাকব। খুলে দেবার জন্য তাঁর পায়ে ধরেও সাধব না—তোমাকেও সুপারিশ করতে ডাকব না। ও কি, রাগ করে চললে নাকি?

বিমলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, রাগ নয়—দুঃখ করেই যাচ্চি। বৌ, নিজের বোনের চেয়ে তোমাকে বেশি ভালবেসেছি বলেই প্রাণটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। দাদা যে অমন করে বলতে পারেন, আমি চোখে দেখে না গেলে বিশ্বাসই করতুম না।

ইন্দু হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, বক্তৃতা করা কখনো তাঁর মুখে শুনবে না।

বক্তৃতা তুমিও কিছু কম করনি বৌ। তবে তিনি যে আর কখনো করবেন না, তা আমারও মনে হয়। এক কথা একশ'বার বলবার লোক তিনি নন।

ইন্দু আবার হাসিয়া বলিল, সেও বটে,—তবে আর একটা গুরুতর কারণ ঘটেচে, যাতে আর কোনদিন স্বপ্নেও চোখ রাঙাতে সাহস করবেন না। আমার বাবার চিঠি পেলুম। তিনি আমার নামে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন। কি বল ঠাকুরঝি, পায়ে ধরবার আর দরকার আছে বলে মনে হয়?

বিমলার মুখ যেন আরও অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল, বৌ, এর পূর্বে কখনো তোমাকে তিনি চোখ রাঙাননি। যা করে তাঁকে ফেলে রেখে তুমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলে, সে আমি ত জানি; কিন্তু তবুও কোনোদিন এতটুকু তোমার নিন্দে করেন নি। হাসিমুখে তোমার সমস্ত দোষ আমার কাছেও ঢেকে রেখেছিলেন—সে কি তোমার টাকার লোভে? বৌ, শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না। যে জিনিস তুমি তেজ করে হেলায় হারাচ্চো—সেদিন টের পাবে যেদিন যথার্থই হারাবে। কিন্তু এই একটা কথা আমার মনে রেখো বৌ, আমার দাদা অত নীচ নয়। আর না, সন্ধ্যা হয়—চললুম, কাল-পরশু একবার সময় হলে আমাদের বাড়ি এসো।

আচ্ছা, বলিয়া ইন্দু পিছনে সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া

উপস্থিত হইল। তাহার মৃদু পদশব্দ বিমলা যে শুনিয়াও শুনিল না, তাহা সে বুঝিল! গাড়িতে উঠিয়া বসিলে বুথ বাড়াইয়া চিরদিন এই দুটি সখী পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া, হাসিয়া কপাট বন্ধ করে। আজ গাড়িতে ঢুকিয়াই বিমলা দরজা টানিয়া দিল।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

বিমলা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার খরতপ্ত কথাগুলো রাখিয়া গেল। ইহার উত্তাপ যে কত, এইবার ইন্দু টের পাইল। এই তাপে তাহার অহঙ্কারের অভ্রভেদী তুষারস্তূপ যতই গলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই এক-একটি নূতন বস্তু তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। এত কাদামাটি—আবর্জনা—এত কর্কশ-কঠিন শিলাখণ্ড যে এই ঘনীভূত জলতলে আবৃত হইয়া ছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

হঠাৎ তাহার অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, এ কেমন হয় ইন্দু, যদি তিনি মনে মনে তোমাকে ত্যাগ করেন? তুমি কাছে গিয়ে বসলেও যদি তিনি ঘৃণায় সরে বসেন?

তাহার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল।

কমলা কহিল, কি মা?

ইন্দু তাহাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখে চুমা খাইয়া বলিল, তোর পিসীমা এত ভয় দেখাতেও পারে!

কিসের ভয় মা?

ইন্দু আর একটি চুমা খাইয়া বলিল, কিছু না মা, সব মিথ্যে—

—সব মিথ্যে! যা তো মা, দেখে আয় তোর বাবা কি কচ্চেন?

মেয়ে ছুটিয়া গেল। আজ দু'জন স্বামী-স্ত্রীতে একটা কথাও হয় নাই! কমলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা চুপ করে শুয়ে আছেন।

চুপ করে? আচ্ছা, তুই শুয়ে থাক্ মা, আমি দেখে আসি, বলিয়া ইন্দু নিজে চলিয়া গেল। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাই বটে! তিনি উপরের দিকে চাহিয়া সোফায় শুইয়া আছেন। মিনিট পাঁচ-

ছয় দাঁড়াইয়া দেখিয়া ইন্দু ফিরিয়া আসিল। আজ প্রবেশ করিতে সাহস হইল না দেখিয়া সে নিজেই ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কমলা!

কি মা?

তোর বাবার বোধ হয় খুব মাথা ধরেচে। যা মা, বসে বসে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দে গে।

মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়া ইন্দু নিজে আড়ালে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দুইজনের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

কন্যা প্রশ্ন করিল, কেন এত মাথা ধরেচে বাবা?

পিতা উত্তর দিলেন, কই, ধরেনি ত মা!

কন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মা বললেন যে খুব ধরেচে?

পিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, তোমার মা জানে না।

পর্দা ঠেলিয়া ইন্দু সহজভাবে ঘরে ঢুকিল। টেবিলের আলোটা কমাইয়া দিয়া কহিল, রোগা শরীরে এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়! যা ত মা কমলা, ওপর থেকে ওডিকোলনের শিশিটা নিয়ে আয়—আর রামটহলকে একটু বরফ কিনে আনতে বলে দে।

মেয়েকে তুলিয়া দিয়া ইন্দু শিয়রে আসিয়া বসিল। চুলের মধ্যে হাত দিয়া বলিল, মাথায় আগুন উঠচে যেন।

নরেন্দ্র চোখ বুজিয়া রহিল—কিছুই বলিল না। ইন্দু নীরবে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সস্নেহ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বুকের ব্যথাটা কেমন আছে?

তেমনি।

তবে এই যে রাগ করে দু'দিন ওষুধ খেলে না, বেড়ে গেলে কি হবে বল ত?

নরেন্দ্র চোখ মেলিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, আমার শরীরটা ভাল নেই—একটু চুপ করে থাকতে চাই ইন্দু।

এই কথার এই জবাব।

ইন্দু তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাই থাকো। আমার ঘাট হয়েছে, তোমার ঘরে ঢুকেছিলাম।

দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, নিজের প্রাণটা নষ্ট করে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, বাবা আমাকে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন। বলিয়া বাঁ হাতে চিঠিটা সোফার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর মুখে আঁচল গুঁজিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কথা সহিতে, হার মানিতে সে শিখে নাই—অনেক নারীই শিখে না—তাই আজ তাহার সমস্ত সাধু-সংকল্পই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফিরিয়া আসিল।

৮

ও কি ঠাকুরঝি,—তোমরা কাঁদছিলে নাকি? চোখ-দুটি তোমাদের যে জবাফুল হয়েছে!

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী শুনিতেছিলেন এবং বিমলা উপুড় হইয়া বই পড়িতেছিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল,—উঃ। দুর্গামণির দুঃখে বুক ফেটে যায় বৌ!

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কে দুর্গামণি?

ন্যাকা সেজো না বৌ। জানো না, কে দুর্গামণি? চারিদিকে যে এত সুখ্যাতি বেরিয়েচে, তা ঠিক বটে।

ইন্দু আর কিছুই বুঝিল না, শুধু বুঝিল একখানা বইয়ের কথা হইতেছে। হাত বাড়াইয়া কহিল, দেখি বইটা।

হাতে লইয়া উপরে দেখিল গ্রন্থকার—তাহার স্বামীর নাম লেখা। পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল উৎসর্গ করা হইয়াছে বিমলাকে। ইন্দু বইখানা আগা-গোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিল। লেখা হইয়াছে,

ছাপা হইয়াছে, দেওয়া হইয়াছে—অথচ সে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিমলা আর একটা প্রশ্ন করিতেও সাহস করিল না, তখন ইন্দু নিজেই বলিল, আমার নাটক-নভেল পড়তে ইচ্ছেও করে না, ভালও লাগে না। যা হোক, ভাল হয়েচে শুনে সুখী হলুম।

অম্বিকাবাবুর চাকর আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞাসা কচ্চেন, আজ তাঁর যে যাদুঘর দেখতে যাবার কথা ছিল—যাবেন?

এই বধূটি সকলের চেয়ে ছোট; সে লজ্জা পাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, না, তাঁর শরীর এখনো তেমন সারেনি—আজ যেতে হবে না।

চাকর চলিয়া গেল, ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এমন আশ্চর্য কথা সে জীবনে শোনে নাই।

ভোলা আসিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু অফিস থেকে জানতে লোক পাঠিয়েছেন—একটা বড় আলমারি-দেরাজ নীলাম হচ্ছে। বড় ঘরের জন্য কেনা হবে কি?

বিমলা কহিল, না, কিনতে মানা করে দে। একটা ছোট বুক্‌কেস্ হলেই ও-ঘরের হবে।

ভোলা চলিয়া গেল। ইন্দু মহাবিস্ময়ে অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। এই স্বামীদের প্রশ্নগুলোতেও সে বেশি প্রভুত্ব দেখিতে পাইল না, ইহাদের স্ত্রী-দুটির আদেশগুলোও তাহার কাছে ঠিক দাসীদের মত শুনাইল না। অথচ, তাহার নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি করিয়া যেন ইহাদের কাছে সে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় বিমলা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বৌ, সত্যিই কি তুমি দাদার এই বইটার কথা জানতে না?

ইন্দু তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, না। আমার ওজন্য মাথাব্যথা

করে না। সারাদিন বসেই ত লিখচে—কে অত খোঁজ করে বল? ভাল কথা ঠাকুরঝি, কাল বাপের বাড়ি যাচ্ছি।

বিমলা উদ্বিগ্ন হইয়া হইয়া কহিল, বৌ, যেয়ো না।

কেন?

কেন সে কি বুঝিয়ে বলতে হবে বৌ? দাদা তোমাকে তাঁর দুঃখের সুখের কোন ভারই দেন না—তাও কি চোখে দেখতে পাও না? স্বামীর ভালবাসা হারাচ্চ—তাও কি টের পাও না?

ইন্দু হঠাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, অনেকবার বলেচি তোমাকে, আমি চাই নে—চাই নে—চাই নে। আমি দাদার ওখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব; ইনি যেন আর আমাকে আনতে না যান—আর যেন আমাকে জ্বালাতন না করেন।

এবার বিমলাও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, এ-সব বড়াই পুরুষ-মানুষের কাছে কোরো বৌ, আমি ত মেয়েমানুষ, আমার কাছে কোরো না। তোমার বাপেরা বড়লোক, তোমার সংস্থান তাঁরা করে দিয়েচেন—এই ত তোমার অহঙ্কার? আচ্ছা, এখন যাচ্ছো যাও; কিন্তু একদিন হুঁশ হবে, যা হারালে তার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীটাও ছোট। বৌ, যা তুমি পেয়েছিলে, কম মেয়েমানুষেই তা পায়—সে জানি, কিন্তু যে অপব্যয় তুমি করলে, তাতে অক্ষয়ও ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। বোধ করি গেলও তাই।

সেই বইখানা বিমলার হাতেই ছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ইন্দুর বুকের ভেতরটা আর একবার হুহু করিয়া উঠিল। বলিল, অহঙ্কার করবার থাকলেই লোকে করে। কিন্তু, আমার সর্বনাশ হয় হবে, যায় যাবে, সেজন্যে ঠাকুরঝি, তুমিই বা মাথা গরম কর কেন, আমিই বা যা-তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি কেন? আমার থাকতে ইচ্ছে নেই,—থাকব না। এতে যা হয় তা হবে—কারু পরামর্শ নিতেও চাই নে, ঝগড়া করতেও চাই নে।

বিমলা মৌন হইয়া রহিল। তাহার ব্যথা অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু এ-অপমানের পরে আর সে তর্ক করিল না।

ইন্দু অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই কহিল, দাঁড়াও ত বৌ, তুমি সম্পর্কে বড়, একটা প্রণাম করি।

৯

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সমস্ত আকাশ ঝাঁপিয়া মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ইন্দু মেয়ে লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ তার ছোট-ভগিনীপতি আসিয়াছিলেন, পাশের ঘর হইতে তাঁহাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো গল্প-গুজবের অস্ফুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ততই কিসের অব্যক্ত লজ্জায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

তিন মাস হইতে চলিল, সে মেদিনীপুরে আসিয়াছে। ছোট-ভগিনীও আসিয়াছে। তাহার স্বামী এই দুই মাসের মধ্যে শান্তিপুর হইতে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়বার আসা-যাওয়া করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র একটিবারও আসিলেন না, একখানি চিঠি লিখিয়াও খোঁজ করিলেন না।

কিছুদিন হইতে ব্যাপারটার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং প্রায়ই আলোচনা হইতেছে। ছোট-ভগিনীপতির ঘরে সকলের সম্মুখে পাছে এই কথাটাই উঠিয়া পড়ে, এই ভয়েই ইন্দু অসময়ে পলাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী আসেন না। তাঁহার অবহেলায় বেদনা কত, সে ইন্দুর নিজের কথা—সে যাক। কিন্তু ইহাতে এত যে ভয়ানক লজ্জা, এ-কথা সে ত একদিনও কল্পনা করে নাই। ভ্রূণহত্যা, নরহত্যার মত এ যে কেবল লুকাইয়া ফিরিতে হয়। মরিয়া গেলেও যে কাহারো কাছে স্বীকার করা যায় না, স্বামী ভালবাসেন না!

এতদিন স্বামীর ঘরে স্বামীর পাশে বসিয়া তাঁহাকে টানিয়া পিটিয়া নিজের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা বাড়াইয়া তুলিতেই সে অহরহ ব্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন পরের ঘরে, চোখের আড়ালে সমস্তই যে ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে—কি করিয়া সে খাড়া করিয়া রাখিবে?

আজ ভগিনীপতি আসার পর হইতে যে-কেহ তাহার পানে চাহিয়াছে, তাহার মনে হইয়াছে, তাহাকে করুণা করিতেছে। কমলাকে কেহ তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দু মরমে মরিয়া যায়, বাড়ি ফিরিবার প্রশ্ন করিলে লজ্জায় মাটিতে মিশিতে চায়।

অথচ আসিবার পূর্ব্বে স্বামিকে সে অনেকগুলো মর্মান্তিক কথা বলিয়া আসিয়াছিল, প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা হইলে যেন লইয়া আসে।

হঠাৎ ইন্দুর মোহের ঘোর কাটিয়া গেল—কমলা, কাঁদছিস্ কেন মা?

কমলা রুদ্ধস্বরে বলিল, বাবার জন্যে মন কেমন কচ্চে।

ইন্দুর বুকের উপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িল, সে মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরের প্রবল বারিবর্ষণ তাহার লজ্জা রক্ষা করিল—কন্যা ছাড়া এ কান্না আর কেহ শুনিতে পাইল না।

তাহার জননী শিখাইয়া দিলেন কিনা জানি না, পরদিন সকাল হইতেই কমলা পিতার কাছে যাইবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিল। প্রথমে ইন্দু অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া, শেষে দাদাকে আসিয়া কহিল, কমলা কিছুতেই থামে না—কলকাতায় যেতে চায়।

দাদা বলিলেন, থামাবার দরকার কি বোন, কাল সকালেই তাকে নিয়ে যা। কেমন আছে নরেন? সে আমাকে ত চিঠিপত্র লেখে না, তোকে লেখে ত?

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, হুঁ।

ভাল আছে ত?

ইন্দু তেমনি করিয়া জানাইল, আছেন।

বিমলা অবাক হইয়া গেল—কখন এলে বৌ?

এই আসছি।

ভৃত্য গাড়ি হইতে ইন্দুর তোরঙ্গ নামাইয়া আনিল। বিমলা দারুণ বিরক্তি কোনমতে চাপিয়া কহিল, বাড়ি যাওনি?

না। শুধু কমলাকে সুমুখ থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেচি। শুধু তার জন্যেই আসা—নইলে আসতুম না।

বিমলা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই ভাল করতে বৌ। ওখানে তোমার আর গিয়েও কাজ নেই।

ইন্দুর বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল—কেন ঠাকুরঝি?

বিমলা সহজ গম্ভীরভাবে কহিল, পরে শুনো। কাপড় ছাড়ো, মুখহাত ধোও—যা হবার সে ত হয়েই গেছে—এখন, আজ শুনলেও যা, দু'দিন পরে শুনলেও তাই।

ইন্দু বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, সে হবে না ঠাকুরঝি, না শুনে আমি একবিন্দু জলও মুখে দেব না। তাঁকে দেখতে পেয়েচি, তিনি বেঁচে আছেন—তবু সেখানে আমার গিয়ে কাজ নেই কেন?

বিমলা খানিক থামিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যিই ও বাড়িতে তোমার জায়গা নেই। এখন তোমার পক্ষে এখানেও যা, বাপের বাড়িতেও তাই। ও-বাড়িতে তুমি থাকতে পারবে না।

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আর সইতে পারি নে ঠাকুরঝি, কি হয়েছে খুলে বল। বিয়ে করেচেন?

বিশ্বাস হয়?

না। কিছুতেই না। আমার অপরাধ যত বড়ই হোক, কিন্তু তিনি অন্যায় কিছুতেই করতে পারেন না। তবুও কেন আমার তাঁর পাশে স্থান নেই, বলবে না? বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিমলার নিজের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু অশ্রু ঝরিল না। বলিল, বৌ, আমি ভেবে পাই নে, কি ক'রে তোমাকে বোঝাব, সেখানে আর তোমার স্থান নেই। শম্ভুবাবু দাদাকে জেলে দিয়েছিল।

ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—তার পরে?

বিমলা বলিল, আমরা তখন কাশীতে, শম্ভুবাবু টাকা যোগাড় করবার দু'দিন সময় দেয়। কিন্তু চার হাজার টাকা যোগাড় হয়ে ওঠে

না। ধরে নিয়ে যাবার পরে দাদা ভোলাকে আমার কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু আমরা তখন এলাহাবাদে চলে যাই; সে ফিরে আসে আবার যায়; ঐ-রকম করে দশ দিন দেরি হয়ে যায়। তার পরে আমি এসে পড়ি। আমার কাছেও নগদ টাকা ছিল না, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে, এগার দিনের দিন দাদাকে বার করে নিয়ে আসি। তোমারও ত চার-পাঁচ হাজার টাকার গয়না আছে বৌ, মেদিনীপুরও দূর নয়। তোমাকে খবর দিতে পারলে, এসব কিছুই হতে পারত না। দাদা বরং দশ দিন জেল ভোগ করলেন, কিন্তু তোমার কাছে হাত পাতলেন না। আর তোমার তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে? অনেক সুখই ত তাঁকে দিলে তুমি, এবার মুক্তি দাও—তিনিও বাঁচুন, তুমিও বাঁচো।

ইন্দু এক মুহূর্ত্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একে একে গায়ের সমস্ত অলংকার খুলিয়া ফেলিয়া, বিমলার পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, এই নিয়ে তোমার নিজের জিনিস উদ্ধার করে এনো ঠাকুরঝি···আমি তাঁর কাছেই চললাম। তুমি বলচ স্থান হবে না,—কিন্তু আমি বলচি, এইবারেই আমার তাঁর পাশে যথার্থ স্থান হবে। যা এতদিন আমাকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে, আমি নিজের স্থান নিতে চললুম। কাল একবার যেয়ো ভাই,—গিয়ে তোমার দাদা আর বৌদিকে দেখে এসো,—চললুম। বলিয়া ইন্দু গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ওরে ভোলা, সঙ্গে যা, বলিয়া বিমলা চোখ মুছিয়া, পিছনে পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

———

আলো ও ছায়া

এক

প্রথমেই যদি তোমরা ধরিয়া ব'স, এমন কখ্‌খনো হয় না, তবে ত আমি নাচার। আর যদি বল হইতেও পারে—জগতে কত কি যে ঘটে, সবই কি জানি? তা হলে এ কাহিনী পড়িয়া ফেল: আমার বিশ্বাস, তাহাতে কোন মারাত্মক ক্ষতি হইবে না। আর গল্প লিখিতে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা হয় না যে, সবটুকু খাঁটি সত্য বলিতে হইবে। হ'লই বা দু-এক ছত্র ভুল, হ'লই বা একটু-আধটু মতভেদ—এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়? তা নায়কের নাম হইল যজ্ঞদত্ত মুখুজ্যে—কিন্তু সুরমা বলে আলোমশাই। নায়িকার নাম ত শুনিলে, কিন্তু যজ্ঞদত্ত তাকে বলে ছায়াদেবী। দিন-কতক তাহাদের ভারী কলহ বাধিয়া গেল, কে যে আলো—কে যে ছায়া, কিছুতেই মীমাংসা হয় না; শেষে সুরমা বুঝাইয়া দিল, এটা তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধিতে আসে না যে, তুমি না থাকিলে আমি কোথাও নাই—কিন্তু আমি না থাকিলে তুমি চিরজীবি; তাই তুমি আলো, আমি ছায়া।

যজ্ঞদত্ত হাসিল, এক তরফা ডিগ্রী পেতে চাও কর, কিন্তু বিচারটা কোন কাজের হ'ল না।

সুরমা। খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে আলোমশাই, আর ঝগড়া করতে হবে না। তুমি আলোমশাই, আমি শ্রীমতী ছায়াদেবী। বলিতে বলিতে ছায়াদেবী নানারূপে আলোমশাইকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

গল্পের এতটুকু ত হ'ল। কিন্তু এইবার তোমাদের সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ না বাধিয়া গেলে বাঁচি। তুমি কহিবে, ইহারা স্ত্রী-পুরুষ; আমি কহিব, স্ত্রী-পুরুষ বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নয়। নিশ্চয় তুমি চোখ রাঙ্গাইবে, তবে কি অবৈধ প্রণয়? আমি বলিব, খুব শুদ্ধ ভালবাসা। কিছুতেই তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না, মুখ ভার করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে,

কত বয়স? আমি কহিব, আলোর বয়স তেইশ, আর ছায়ার বয়স আঠার। এর পরেও যদি শুনিতে চাও, আরম্ভ করিতেছি।

যজ্ঞদত্তের ছোট করিয়া দাড়ি ছাঁটা, চোখে চশমা, মাথায় ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, পরনে কুঞ্চিত ঢাকাই কাপড়, সার্টে এসেন্স মাখান, পায়ে মখমলের কাজ-করা শ্লিপার—ছায়া স্বহস্তে ফুল তুলিয়া দিয়াছে। লাইব্রেরিতে এক-ঘর পুস্তক, বাটীতে বিস্তর দাসদাসী। টেবিলের ধারে বসিয়া যজ্ঞদত্ত পত্র লিখিতেছিল। সম্মুখে মস্ত মুকুর। পর্দা সরাইয়া ছায়াদেবী সাবধানে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা চুপি চুপি চোখ টিপিয়া ধরে; পিঠের কাছে আসিয়া হাত বাড়াইতে গিয়া সম্মুখে দর্পণে নজর পড়িল। দেখিল, যজ্ঞদত্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সুরমাও হাসিয়া ফেলিল; বলিল, কেন দেখে ফেললে?

যজ্ঞ। সেটা কি আমার দোষ?

সুরমা। তবে কার?

যজ্ঞ। অর্ধেকটা তোমার, আর অর্ধেকটা ঐ আরশিখানার।

সুরমা। এখনই আমি ওটা ঢেকে দেব!

যজ্ঞ। তা দিও, কিন্তু বাকীটার কি হবে?

সুরমা বার-দুই নড়িয়া চড়িয়া কহিল, আলোমশাই!

যজ্ঞ। কেন ছায়াদেবী?

সুরমা। তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?

যজ্ঞ। তা ত আমার বিশ্বাস হয় না।

সুরমা। তুমি খাও না কেন?

যজ্ঞদত্ত হাসিয়া উঠিল—সুরো, কোন্দল করতে এসেচ?

সুরমা। হুঁ।

যজ্ঞ। আমি তাতে রাজী নই।

সুরমা। তুমি বিয়ে করবে না কেন?

যজ্ঞ। সে জবাব ত রোজই একবার করে দিয়ে এসেচি!

সুরমা। না, করতেই হবে।

যজ্ঞ। সুরো, তুমি একটি বিয়ে কর না কেন?

সুরমা। যজ্ঞদত্তের হাত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া কহিল, ছিঃ, বিধবার কি বিয়ে হয়?

যজ্ঞদত্ত। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কে জানে? কেউ বলে হয়, কেউ বলে হয় না।

সুরমা। তবে আমাকে এ নিমিত্তের ভাগী করবার চেষ্টা কেন?

যজ্ঞদত্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে কি চিরকাল শুধু আমারই সেবা করে কাটাবে?

হুঁ, বলিয়া সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যজ্ঞদত্ত অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল, সুরো, কি তোমার মনের সাধ, আমাকে খুলে বলবে না?

সুরমা। আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।

যজ্ঞ। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

সুরমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—দক্ষিণে ও বামে বার-দুই মাথা নাড়িতে গিয়া চোখের জল উৎসের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দুই

সুরমা। যজ্ঞদাদা, সেই গল্পটা আবার বল না।

যজ্ঞ। কোন্‌টা সুরো?

সুরমা। সেই যে আমাকে যবে বৃন্দাবনে কিনেছিলে। কত টাকায় কিনেছিলে গো?

যজ্ঞ। পঞ্চাশ টাকায়। আমার তখন আঠার বছর বয়স। বি. এ. এক্‌জামিন দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাই। মা তখন বেঁচে, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। একদিন দুপুরবেলায় মালতী-কুঞ্জের ধারে একদল বৈষ্ণবী গান গাইতে আসে, তারই মধ্যে প্রথম তোমাকে দেখতে পাই। যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়ে জগৎটাকে এমন সুশ্রী দেখতে হয়

যে, শুধু নিজের দুটি চোখে সে মাধুর্য সবটুকু উপভোগ করতে পারা যায় না ; সাধ হয়, মনের মতন আর দুটি চোখ এমনি করে একসাথে এমনি শোভা সম্ভোগ করতে পারে যদি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি—ও কি সুরমা, কাঁদচ যে ?

সুরমা। না—তুমি বল।

যজ্ঞ। তুমি তখন তের বছরের নবীন বৈষ্ণবী, হাতে মন্দিরা, গান গাইছিলে।

সুরমা। যাও—আমি বুঝি গান গাইতে পারি ?

যজ্ঞ। তখন ত পারতে, তার পর অনেক পরিশ্রমে তোমাকে পাই, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাল্যবিধবা। মা তোমার তীর্থে এসে আর ফিরে যেতে পারেন নি—স্বর্গে গিয়েচেন। আমার মার কাছে তোমায় এনে দিই, তিনি বুকে তুলে নিলেন—তার পর মৃত্যুকালে আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুরমা। যজ্ঞদাদা, আমার বাড়ি কোথায় ?

যজ্ঞ। শুনেছি, কৃষ্ণনগরের কাছে।

সুরমা। আমার আর কেউ নেই ?

যজ্ঞ। আমি আছি, তাই যে তোমার সব, সুরমা।

সুরমার চক্ষু আবার জলে ভিজিয়া আসিল, কহিল, তুমি আমাকে আবার বেচতে পার ?

যজ্ঞ। না, তা পারি না। নিজেকে না বেচে ফেললে ওটি কিছুতেই হতে পারে না।

সুরমা কথা কহিল না, তেমনিভাবে সজল-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি দাদা, আমি ছোট বোন—আমাদের দু'জনার মাঝখানে একটি বৌ আন না দাদা !

যজ্ঞ। কেন বল দেখি ?

সুরমা। সমস্ত দিন ধরে সাজিয়ে গুজিয়ে তাকে আমি তোমার কাছে বসিয়ে রাখব।

যজ্ঞ। তা কি প্রাণ ধরে পারবে?

সুরমা মুখ তুলিয়া চোখের উপর চোখ পাতিয়া কহিল, আমি কি তেমনি অধম যে হিংসা করব?

যজ্ঞ। হিংসা নাই করলে, কিন্তু নিজের স্থানটি বিলিয়ে দেবে?

সুরমা। বিলিয়ে কেন দিতে যাব। আমি রাজা, রাজাই থাকব, শুধু একটি মন্ত্রী বহাল করব, দু'জনে মিলে রাজ্যটা চালাতে আমোদ হবে।

যজ্ঞ। দেখ ছায়া, বিবাহে প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু তোমার যদি একজন সাথীর বড় প্রয়োজন হয়ে থাকে ত বিবাহ করব।

সুরমা। হাঁ, নিশ্চয় কর, খুব আমোদ হবে; দু'জনে খুব মনের সুখে দিন কাটাব। মনে মনে কহিল, তিন কুলে আমার কেউ নাই, আমার মান-অপমান তাও নাই, কিন্তু তুমি কেন আমাকে নিয়ে বিশ্বের কলঙ্ক কুড়াবে? দেবতা আমার! তুমি বিবাহ কর, তোমার মুখ চেয়ে আমার সব সইবে।

তিন

কলিকাতায় প্রতিবাসীর খবর অনেকে রাখে না। যাহারা রাখে তাহারা বলে, যজ্ঞদত্ত এম, এ, পাস করুক, কিন্তু বকাটে ছেলে। ইশারায় তাহারা সুরমার কথাটা উল্লেখ করে। সুরমা ও যজ্ঞদত্ত মাঝে মাঝে তাহা শুনিতে পায়। শুনিয়া দুইজনে হাসিতে থাকে।

কিন্তু তুমি ভাল হও আর মন্দ হও, বড়মানুষ হইলে তোমার বাড়িতে লোক আসিবেই, বিশেষ মেয়েমানুষ। কেহ বা বলে, সুরমা, তোমার দাদার বিয়ে দাও না?

সুরমা। দাও না দিদি, একটি ভাল মেয়ে খুঁজে পেতে।

যে সুরমার সখী সে হাসিয়া ফেলে—তাইত, ভাল মেয়ে মেলা শক্ত, তোমার রূপে যার চোখ ভরে আছে,—তার—

দূর, পোড়ারমুখী। বলিতে বলিতে কিন্তু সুরমার সমস্ত মুখমণ্ডল স্নেহ ও গর্বে রঞ্জিত হয়ে উঠে।

সেদিন দুপুরবেলা ঝুপঝাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সুরমা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, একটি মেয়ে পছন্দ করে এলাম।

যজ্ঞদত্ত। আঃ, একটা দুর্ভাবনা গেল। কোথায় বল দেখি?

সুরমা। ও-পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ি।

যজ্ঞদত্ত। বামুন হয়ে কায়েতের ঘরে?

সুরমা। কায়েতের ঘরে কি বামুন থাকতে নেই? তার মা ও-বাড়িতে রেঁধে খেতো, মেয়েটি শুনেচি ভাল; দেখে এসে যদি মনে ধরে ত ঘরে আন।

যজ্ঞদত্ত। আমি কি এমনি হতভাগ্য যে, রাজ্যের ভিখিরী ছাড়া আমার অন্ন জুটবে না!

সুরমা। ভিখিরী কুড়িয়ে আনা কি তোমার নূতন কাজ?

যজ্ঞদত্ত। আবার!

সুরমা। না যাও, দেখে এস। মনে ধরে ত না ব'ল না।

যজ্ঞদত্ত। মনে কিছুতেই ধরবে না।

সুরমা। ধরবে গো ধরবে—একবার দেখেই এস না।

ছায়াদেবী তখন আলোমশাইকে এমন সাজাইয়া দিল, এত গন্ধ লাগাইয়া মাজিয়া ঘষিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিয়া এমনিভাবে আরশির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল যে, যজ্ঞদত্তের লজ্জা করিতে লাগিল। ছিঃ, এ যে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

সুরমা। তা হোক, দেখে এস।

গাড়ি করিয়া যজ্ঞদত্ত মেয়ে দেখিতে গেল। পথে একজন বন্ধুকেও তুলিয়া লইল। চল, মিত্তির বাড়িতে জলযোগ করে আসি।

বন্ধু। তার মানে?

যজ্ঞদত্ত। সে বাড়িতে একটা ভিখিরী মেয়ে আছে। তাকে বিয়ে করতে হবে।

বন্ধু। বল কি, এমন প্রবৃত্তি?

যজ্ঞদত্ত। তোমরা যার হিংসেয় মরে যাও তিনিই, সেই ছায়াদেবী।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুকে লইয়া মেয়ে দেখিতে ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া, পরনে দেশী কাপড়, কিন্তু অনেক ধোপপড়া সূতাগুলা মাঝে মাঝে জালের মত হইয়া গিয়াছে। হাতে বেলোয়ারি চুড়ি এবং একজোড়া পাক দেওয়া তামার মত রংয়ের সোনার বালা—মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় ভিতরের গালাটা দেখা যাইতেছে। মাথায় এত তেল যে কপালটা পর্যন্ত চকচক করিতেছে, ব্রহ্মতালুর উপর শক্ত খোঁপাটা কাঠের মত উঁচু হইয়া আছে। দুই বন্ধুতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাসি চাপিয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বড় বড় কালো চোখ দুটো শান্তভাবে তাহার মুখের প্রতি রাখিয়া কহিল, প্রতুল।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুর গা টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, ওহে, গদাধর নয় ত?

বন্ধু ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, জ্যাঠামি করো না, তাড়াতাড়ি পছন্দ করে নাও।

হাঁ, এই নিই—

বেশ—বেশ, কি পড়?

কিছু না।

আরো ভালো।

কাজ-কর্ম করতে জান?

প্রতুল মাথা নাড়িল—নিকটে একজন ঝি দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্যাখ্যা করিয়া ছিল—ভারী কর্মী মেয়ে বাবু, রাঁধা-বাড়া সংসারের কাজ-কর্মে মায়ের হাত পেয়েচে। আর মুখে কথাটি নেই—ভারী শান্ত।

তা বুঝেছি।

তোমার বাপ বেঁচে নেই?

না।

মাও মরে গেছেন?

হাঁ।

যজ্ঞদত্ত দেখিল, এই হাবা মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে

তোমার কি কেউ নেই ?

না।

আমার বাড়ি যাবে ?

সে ঘাড় নাড়িল, হুঁ। এই সময় জানালার দিকে নজর পড়ায় সে দেখিল খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দুটো কালো চোখ যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, ভয় পাইয়া সে বলিল, না।

বাহিরে আসিয়া মিত্তিরমহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ।

কেমন দেখলেন ?

বেশ !

বিবাহের তবে দিন স্থির হোক।

হোক।

চার

বার-তের বৎসরের বালকের হাত হইতে কোন নির্দয় রসহীন অভিভাবক তাহার অর্ধ-পঠিত কৌতুকপূর্ণ নভেলটা টানিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, ভিতরের প্রাণটা ব্যাকুলভাবে সেই শুষ্কমুখ শঙ্কিত বালককে এ-ঘর ও-ঘর ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায়, ভয়ে ভয়ে তীব্র চক্ষু দুটি শুধু যেমন সেই প্রিয় পদার্থটিকে আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত এবং বিরক্ত হইয়া থাকে, আর সর্বদাই যেন কাহার উপর রাগ করিতে ইচ্ছা করে, তেমনিভাবে সুরমা যজ্ঞদত্তের জন্য ছটফট করিতে লাগিল। কি যেন কি একটা খুঁজিয়া বাহির করিবে। চেয়ার, বেঞ্চ, শোফা, শয্যা, ঘর, বারান্দা—সুরমার উপরেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাস্তার দিকের একটা জানালাও তাহার পছন্দ হইল না, একবার এটাতে, একবার ওটাতে বসিতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত ঘরে ঢুকিলেন।

কি হ'ল আলোমশাই ? আলোমহাশয়ের মুখ গম্ভীর।

সুরমা। পছন্দ হল ?

যজ্ঞ। হ'ল।

সুরমা। কবে বিয়ে ?

যজ্ঞ। বোধ হয় এই মাসেই।

নিরানন্দ উৎসাহে সুরমা কাছে আসিল, কিন্তু কোনরূপ উপদ্রব করিল না—আমার মাথা খাও, সত্যি বল।

কি বিপদ, সত্যিই ত বলচি !

আমার মরামুখ দেখ—বল, পছন্দ হয়েছে ?

হাঁ।

হঠাৎ যেন সুরমা আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। বালক-বালিকারা ধমক খাইয়া কাঁদিবার পূর্বে যেমন এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়িয়া একটা অর্থহীন কথা বলিয়া ফেলে, সুরমা তেমনি ছেলেমানুষটির মত মাথা হেলাইয়া গাঢ়স্বরে কহিল, তবে বলেছিলাম ত—

যজ্ঞদত্ত নিজের ভাবনায় ব্যস্ত ছিল, তাই বুঝিতে পারিল না যে, এ কথার একেবারে কোন অর্থই নাই ; কেননা, প্রথমতঃ 'পছন্দই হবে' এমন কথা সুরমা কোনকালে উচ্চারণ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, সে নিজেও মেয়ে দেখে নাই বরং এমনটি সে মোটেই আশা করে না যে, এত অল্পে পছন্দ হইবে, এবং এত শীঘ্র সম্বন্ধ পাকা হইবে। তাই সে সমস্ত দিনটা নিজের ঘরে বসিয়া এই কথা তোলপাড় করিতে লাগিল। দু'দিন পরে কিন্তু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা বুঝিতে পারিল, কহিল, সুরো, এ বিয়ে দিও না দিদি।

সুরমা। বাঃ তা কি হয় ? সব যে স্থির হয়ে গেছে।

যজ্ঞ। স্থির কিছুই নয়।

সুরমা। না, তা হতে পারে না, দুঃখীর মেয়েকে সুখী করবে এটাও ভেবে দেখ, বিশেষ কথা দিয়ে ফেরাবে ?

যজ্ঞদত্তের প্রতুলকুমারীর মুখ মনে পড়িল, সহিষ্ণুতা ও শান্তভাবের

নিগূঢ় ছায়া যেন সেদিন তাহার কালো চোখ দুটিতে সে দেখিতে পাইয়াছিল—তাই সে চুপ করিয়া রহিল, তবু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সুরমার কথাই বেশী ভাবিল। বর্ষার দিনে বাদল-পোকাগুলো হঠাৎ যেমন ঘর ভরিয়া দেয়, তেমন তাহার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদিগের নিভৃত বাসগহরটা যেমন কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, তেমনি সুরমার মুখের কথাগুলো মনের কোন গুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া দলে দলে বাহির হইতে লাগিল, সেইটাই খুঁজিয়া পাইল না। চোখে তার এমনি ঝাপসা জাল লাগিয়া রহিল যে, কোনক্রমেই সুরমার মুখখানি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না।

পাঁচ

বিবাহ করিয়া যজ্ঞদত্ত বধূ ঘরে আনিল। বিকারগ্রস্ত রোগী ঘরে লোক না থাকিলে যেমন সমস্ত শক্তি এক করিয়া জলের ঘড়াটার পানে ছুটিয়া গিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, সুরমা তেমনি করিয়া নূতন বধূকে আলিঙ্গন করিল। নিজের যতগুলি গহনা ছিল পরাইয়া দিল, যতগুলি বস্ত্র ছিল সমস্ত তাহার বাক্সে ভরিয়া দিল। শুষ্কমুখে সমস্ত দিন ধরিয়া বধূ সাজাইবার ধুম দেখিয়া যজ্ঞদত্ত মুখ চুন করিয়া রহিল। গাঢ় স্বপ্নটা সহ্য হয়—কেননা, অসহ্য হইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখাটায় যেন দম আটকাইতে থাকে, কিছুতেই সেটা শেষও হয় না—ঘুমও ভাঙ্গে না। মনে হয় একটা স্বপ্ন, মনে হয় এটা সত্য, 'আলো ও ছায়া'র দু'জনেরই এই ভাবটা আসিতে লাগিল।

একদিন ঘরে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, ছায়াদেবী!

কি যজ্ঞদাদা?

আলোমশাই বললে না?

মুখ নত করিয়া সুরমা কহিল, আলোমশাই!

যজ্ঞদত্ত দুই হাত বাড়াইয়া কহিল, অনেকদিন কাছে এস নাই—এস।

সুরমা একবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল ; পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, বাঃ, আমি ত খুব ! বৌকে একলা ফেলে এসেছি। বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

রাগের মাথায় যদি হঠাৎ কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের গালে চড় মারা যায়, আর সে যদি শান্তভাবে ক্ষমা করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে মনটা যেমন খারাপ হইয়া থাকে, তেমনি ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধীর মত তাহারও মনটা ক্রমাগত দমিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলি মনে হয়, সে অপরাধ করিয়াছে আর সুরমা প্রাণপণে ক্ষমা করিতেছে।

সুরমা সর্বাভরণা নববধূকে জোর করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। সন্ধ্যা হইলেই বাহির হইতে কট্ করিয়া তালা বন্ধ করিয়া দেয়। গালে হাত দিয়া যজ্ঞদত্ত ভাবিতে থাকে। বৌও কতক বুঝিতে পারে ; সে সেয়ানা মেয়ে নয় ; তবুও ত সে নারী ; সাধারণ স্ত্রীবুদ্ধিটুকু হইতে ভগবান কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। সেও সারা রাত্রি জাগিয়া থাকে। আজ আট দিনও বিবাহ হয় নাই, এরি মধ্যে যজ্ঞদত্ত একদিন প্রত্যুষে সুরমাকে ডাকিয়া কহিল, সুরো, বর্ধমানে পিসীমাকে বৌ দেখিয়ে আনি।

দামোদর-পারে পিসীমার বাড়ি। সেখানে পৌঁছাইয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, পিসীমা, বৌ এনেচি, দেখ।

পিসীমা। ওমা, বিয়ে করেছিস বুঝি, আহা বেঁচে থাক। দিব্যি চাঁদপানা বৌ, এইবার মানুষের মত ঘর-সংসার কর।

যজ্ঞ। সেই জন্যেই ত সুরো জোর করে বিয়ে দিলে।

পিসীমা। সুরো বুঝি বিয়ে দিয়েচে ?

যজ্ঞ। সেই ত দিলে, কিন্তু কপাল মন্দ—বৌ নিয়ে ঘর করা চলে না।

পিসীমা। কেন রে ?

যজ্ঞ। জানো ত পিসীমা, আমার নর-গণ বৌয়ের হ'ল রাক্ষস-গণ। একসঙ্গে থাকলে গণৎকার বলে—বাঁচি না বাঁচি।

পিসীমা। যাট যাট, সে কথা—

যজ্ঞ। তখন তাড়াতাড়ি এসব দেখা হয়নি, এখন ত তোমার কাছে থাকবে, মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠাব, তাতে চলবে না পিসীমা?

পিসীমা। হ্যাঁ তা চলে যাবে। পাড়াগাঁয়ে বিশেষ কষ্ট হবে না। আহা, চাঁদের মত মেয়ে, ডাগর হয়েছে, হাঁরে যজ্ঞ, একটা-স্বস্ত্যয়ন করলে হয় না।

যজ্ঞ। হতে পারে। আমি ভট্টাচার্যের মত নিয়ে যা ভাল হয় তোমাকে জানাব।

পিসীমা। তা জানাস বাছা।

সন্ধ্যার সময় বৌকে কাছে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, তবে তুমি এখানেই থাক।

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

যা তোমার দরকার হবে আমাকে জানিয়ো।

আচ্ছা।

তুমি চিঠি লিখতে জান?

না।

তবে কি করে জানাবে?

নববধূ গৃহপালিতা হরিণীর মত চক্ষু দুইটি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। যজ্ঞদত্ত মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

পিসীমার বাটিতে বৌ ভোরে উঠিয়া কাজ করিতে লাগিল বসিয়া থাকিতে সে শিখে নাই, নূতন লোক হইলেও সে পরিচিতের মত ঘরকন্নার কাজ করিতে শুরু করিল। দুই-চার দিনেই পিসীমা বুঝিলেন, এমন মেয়ে সবাই গর্ভে ধরে না।

বৌয়ের অনেক গহনা, পাড়াসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে লোক তা দেখতে আসে।

কে দিয়েচে গা ? তোমার বাপ ?

না, বাপ-মা আমার নাই, ঠাকুরঝি দিয়েচেন।

দু-একজন সমবয়সীর সহিত ভাব হইলে তাহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তোমার ঠাকুরঝি বুঝি খুব বড়লোক ?

হ্যাঁ।

সব গহনা তারি ?

সব। তাঁর দরকার নেই, তিনি বিধবা, এ-সব পরেন না।

কত বয়স বৌ ?

আমাদের চেয়ে কিছু বড়। তিনি জোর করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার বর বুঝি তাঁর খুব অনুগত ?

হ্যাঁ, তিনি সতীলক্ষ্মী, সবাই তাঁকে ভালবাসে।

ছয়

উপরের জানালা হইতে সুরমা দেখিল, যজ্ঞদত্ত বাড়ি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সঙ্গে বৌ নাই। ঘরে প্রবেশ করিলে কহিল, যজ্ঞদাদা, বৌকে কোথায় রেখে এলে ?

পিসীর বাড়ি।

সঙ্গে আনলে না কেন ?

থাক, কিছুদিন পরে আনলেই হবে।

কথাটা সুরমার বুকে বিঁধিল। দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়জনের সহিত তর্ক করিতে গিয়া হঠাৎ বচসা হইয়া গেলে যেমন দুইজনেই কিছুক্ষণ ক্ষুণ্ণমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, এ দুইজনও কিছুদিন তেমনি চুপচাপ দিন কাটাইতে লাগিল। সুরমা কহে, নেয়ে

খেয়ে নাও, অনেক বেলা হল। যজ্ঞদত্ত বলে, হাঁ এই যাই, এমনি করিয়াও কিছুদিন কাটিল। একসঙ্গে ঘর করিতে গিয়া চিরদিন এভাবে চলে না, তাই আবার মিল হইতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত আবার আদর করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—ও ছায়াদেবী! ছায়া কিন্তু আর আলোমশাই বলে না—যজ্ঞদাদা বলে, কখনও বা শুধু দাদা বলিয়াই ডাকে।

সুরমা একদিন কহিল, দাদা, প্রায় তিনমাস হতে চলল, এইবার বৌকে আনো। যজ্ঞদত্ত কাটাইয়া দেয়, হাঁ তা হবে এখন।

মনের ভাব বুঝিয়া সুরমা চুপ করিয়া থাকে।

পিসীর পত্র মাঝে মাঝে আসে। পিসী লেখেন, বৌয়ের ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছে, চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। মনের ভাব বুঝিয়া যজ্ঞদত্ত কতকগুলো টাকা বেশী করিয়া পাঠাইয়া দেয়। আর মাস-খানেক কোন কথা উঠে না।

এমন সময় একদিন হঠাৎ চিঠি আসিল যে, পিসী মরিয়া গিয়াছে। যজ্ঞদত্ত বর্ধমানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সুরমা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিল, বৌকে নিয়ে এস।

বর্ধমানে পিসীর শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেলে একদিন দুপুরবেলা যজ্ঞদত্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়ি যাইবার কথা ভাবিতেছিল। উঠানে একটা ধানের মরাইয়ের পাশে, নতুনবৌ দাঁড়াইয়া, চোখে পড়িল। চোখাচোখি হইবামাত্র সে হাত দিয়া ইশারা করিয়া ডাকিল।

যজ্ঞদত্তও স্ত্রীর নিকটে পৌঁছিল!

কি?

আপনাকে কিছু বলব।

বেশ ত বল!

নতুন বৌ ঢোক গিলিয়া কহিল, একদিন আপনি বলেছিলেন যদি আমার কোন দরকার হয়—

যজ্ঞদত্ত। বেশ ত, কি দরকার বল?

বৌ। বাড়িতে সবাই বলাবলি কচ্ছিলেন, আমি বড় অলক্ষণা, তাই এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না।

যজ্ঞদত্ত। কোথায় থাকতে চাও?

বৌ। কলকাতায় যদি কোন ভদ্র-পরিবারে স্থান পাই—আমি ত সব কাজ কত্তে পারি।

যজ্ঞদত্ত। তোমার নিজের বাড়িতে যাবে?

বৌ। আমার নিজের বাড়ি? সে আবার কোথা? তাঁরা কি আর থাকতে দেবেন?

যজ্ঞদত্ত হাত দিয়া স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, আমার বাড়িতে যাবে?

বৌ। যাব।

যজ্ঞদত্ত। সুরমা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে।

সুরমার কথায় তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল,—ঠাকুরঝি আমায় মনে করেন?

যজ্ঞদত্ত। করেন বৈ কি।

বৌ। তবে নিয়ে চলুন।

জগতে একরকমের লোক আছে, তাহারা পরের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার বুদ্ধি কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু এমন একটা সহজ বুদ্ধি রাখে যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিজের সম্বন্ধে অপরের পরামর্শ মোটেই প্রয়োজন বোধ করে না। নূতন বৌটি এই শ্রেণীর। সে নিজের কথা নিজেই ভাবে—পরকে জিজ্ঞাসা করে না। ভাবিয়া কহিল, আপনাদের অকল্যাণ করবার বড় ভয় আমার, কিন্তু থাকি বা কোথায়? না হয়, নামি নীচেই থাকব, সব কাজকর্ম করতে নীচে থাকাই সুবিধের।

যজ্ঞ। উপরে কি তোমার থাকবার ঘর নেই?

বৌ। আছে, কিন্তু নীচের ঘরেই বেশ থাকবো।

যজ্ঞদত্ত আর কোন কথা কহিল না। ভাবিতে লাগিল যে, খুব

বোকার মত ত এ কথাগুলো নয় এবং কয়েকবার মনে করিল, বলিয়া ফেলে যে সে অলক্ষণা নহে, রাক্ষসগণ প্রভৃতি মিথ্যা কথা। কিন্তু মিথ্যা কথার কারণটি কি, তা কি করিয়া বলা যায়! বিশেষ বাড়ি গিয়া সে তাহার অতীত এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারে যে বেশ মিল করিয়া তুলিতে পারিবে, সে ভরসা মনে করিতে পারিল না।

সাত

সুরমা দেখিল বৌ আসিয়াছে। উগ্র নেশার প্রথম ঝোঁকটা কাটাইয়া দিয়া সে স্থির হইয়াছে। তাই বৌ দেখিতে বাড়াবাড়ি করিল না। শান্ত ধীরভাবে প্রিয়সম্ভাষণ করিল, মৌখিক নহে, অন্তরগত মঙ্গলেচ্ছা তাহার শুষ্ক মুখের উপর জ্যোতি ফিরাইয়া আনিল।

বৌ, কৈ ভাল ছিলে না ত?

বৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, মাঝে মাঝে জ্বর হ'ত।

সুরমা তাহার কপালে ঘাম মুছাইয়া বলিল, এখানে চিকিৎসা হলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

দুপুরবেলা সংবাদ পাইল যে, বৌয়ের জন্য নীচে ঘর পরিষ্কার হইতেছে। অপমানে তাঁহার চোখে জল আসিল। সংবরণ করিয়া যজ্ঞদত্তের কাছে গিয়া বলিল, দাদা, বৌ কি নীচে শোবে? তুমি কিছু বলবে না।

আর কি বলব? যার যা খুশি তা করুক।

সুরমা লজ্জা ও ধিক্কারে আপনাকে শাসন করিতে পারিল না, সম্মুখেই কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। উপরের গোলযোগটা কিন্তু নীচে পৌঁছিল না।

নূতন বৌ নূতন করিয়া সংসারের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে সুরমার সব কাজগুলি নিজের

হাতে তুলিয়া লইল। শুধু উপরে যায় না—স্বামীর সহিত দেখা করে না। ক্রমে সুরমাও উপর ছাড়িয়া দিল। বৌ প্রফুল্ল গম্ভীরমুখে কাজ করিত, সুরমা পাশে বসিয়া থাকিত। একজন দেখাইত কর্ম করিয়া কত সুখ, অপর বুঝিত কর্মস্রোতে অনেক দুঃখ ভাসাইয়া দিতে পারা যায়। দু'জনের কেহই বেশী কথা কহে না, তাহাদের সহানুভূতি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে নূতন বধুর প্রায় জ্বর হয়, দুই-চারিদিন উপবাস থাকিয়া আপনি সারিয়া ওঠে। ঔষধে প্রবৃত্তি নাই, ঔষধ খায় না। সে-সময়ের কাজকর্মগুলা দাসদাসীতেই করে; সুরমা পারিয়া উঠে না, ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্যে কুলায় না। সোনার প্রতিমা সুরমা দেবীর এখন সে রং নাই, সে কান্তি নাই, অত লাবণ্য দুই মাসের মধ্যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। বৌ মাঝে মাঝে বলে, ঠাকুরঝি, তুমি দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

আমি? আচ্ছা বৌ, শরীরটা ভাল করবার জন্যে আমি যদি বিদেশে যাই, তোমার কষ্ট হবে না ত?

হবে বৈ কি।

তবে যাব না?

না ঠাকুরঝি, যেয়ো না, তুমি ঔষধ খেয়ে এখানেই ভাল হও।

সুরমা স্নেহভরে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

একদিন সুরমা যজ্ঞদত্তের খাবার সাজাইতেছিল। যজ্ঞদত্ত তাহার মলিন কৃশ মুখখানি সতৃষ্ণ চক্ষে দেখিতেছিল। সুরমা মুখ তুলিলে, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হয় মলেই বাঁচি!

কেন? বলিতেই সুরমার চক্ষে জল আসিল। ভয় হয় আর কতদিন এ প্রাণটাকে বয়ে বেড়াতে হবে। বন্দুকের গুলি খাইয়া বনের পশু যেমন মাটি ছাড়িয়া আকাশে পলাইবার জন্য প্রাণপণে লাফাইয়া উঠে, কিন্তু আকাশ তাহার কেহ নয়, তাই সেই আশ্রয়-শূন্য মরণাহত জীব শেষে চিরদিনের আশ্রয় পৃথিবীকেই জড়াইয়া ধরিয়া

প্রাণত্যাগ করে, তেমনি ছটফট করিয়া সুরমা প্রথমে আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, তারপর তেমনি করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, যজ্ঞদাদা, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার শত্রু, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে, তুমি সুখী হও।

তখনি হয়ত দাসী আসিয়া পড়িবে, যজ্ঞদত্ত হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিল। সস্নেহে অশ্রু মুছাইয়া কহিল, ছিঃ, ছেলেমানুষি ক'র না।

অশ্রু মুছিতে মুছিতে সুরমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

আট

তার পরে একদিন সুরমা বৌকে টানিয়া কাছে লইয়া কহিল, বৌ দাদা কি তোমাকে কখন কিছু বলেচেন?

বৌ সহজভাবে উত্তর দিল, কি আবার বলবেন?

তবে তুমি কখন তাঁর কাছে যাও না কেন? তোমার কি যেতে ইচ্ছা করে না?

বৌয়ের প্রথমটা লজ্জা করিতে লাগিল, পরে মুখ নত করিয়া কহিল, করে দিদি, কিন্তু যাবার ত জো নেই!

কেন বৌ?

তোমার কি মনে নেই?

কৈ না।

ওঃ, তুমি বুঝি ভুলে গেছ ঠাকুরঝি, আমার যে রাক্ষস-গণ, ওঁর নর-গণ।

কে বলেচে?

উনিই পিসীমাকে বলেছিলেন, তাইতে—

সুরমা শিহরিয়া উঠিল—এ যে মিছে কথা বৌ।

মিছে কথা?

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে সুরমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সুরমা বার বার শিহরিয়া উঠিল—মিছে কথা বৌ, ভয়ানক মিছে কথা।

আমার বিশ্বাস হয় না, উনি মিছে কথা বলবেন ?

সুরমা আর সহিতে পারিল না—দুই বাহুর মধ্যে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৌ, আমি মহাপাতকী।

বধূ আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, কেন ঠাকুরঝি ?

উঃ, তা আর শুনতে চেয়ো না। আমি বলতে পারব না।

ঝড়ের মত সুরমা যজ্ঞদত্তের সম্মুখে আসিয়া পড়িল.—বৌকে এমন করে ঠকিয়ে রেখেচ, উঃ, কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী তুমি !

যজ্ঞদত্ত অবাক হইয়া গেল। ও কি সুরো ?

কৃতবিদ্য তুমি, ছি ছি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

যজ্ঞদত্ত অর্থ বুঝিল না, শুধু কটুকথা শুনিতে লাগিল।

কি ভেবে বিয়ে করেছিলে ? কি ভেবে ত্যাগ করে আছ ? আমার জন্য ? আমার মুখ চেয়ে এই প্রতারণা করে আসচ ?

সুরমা, পাগল হয়ে গেলে ?

পাগল আমি ? তোমার চেয়ে আমার জ্ঞান আছে, দাও আমাকে কোথাও পাঠিয়ে। সুরমার চক্ষু রক্তবর্ণ, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, এক দণ্ডও আমি থাকতে চাই না, ছিঃ ছিঃ !

যজ্ঞদত্ত চীৎকার করিয়া কহিল, কি বলচ ?

বলচি তুমি মিথ্যাবাদী—প্রতারক।

নিমেষে যজ্ঞদত্তের মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অকারণে মনে হইল, তাহার ভিতরের অন্তরটা বাহির হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ডাকিতেছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া সে টেবিলের উপরিস্থিত ভারী রুলার তুলিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, আমি অধম, আমি প্রতারক, আমি মিথ্যাবাদী, এই তার প্রায়শ্চিত্ত করচি।

বিপুল বলের সহিত যজ্ঞদত্ত স্ব-মস্তকে ভীষণ আঘাত করিল। মাথা ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্তস্রোত বহিল। সুরমা অস্ফুটে ডাকিল,

মাগো! তার পর অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। যজ্ঞদত্ত তাহা দেখিল, দেখিল তার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিতেছে, চোখের ভিতর রক্ত ঢুকিয়া সমস্ত ঝাপসা বোধ হইতেছে। সে উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিল, আর কেন? এই সময় পিছন হইতে কে ধরিয়া ফেলিল। ফিরিয়া দেখিল স্ত্রী; কাঁদিয়া বলিল, তুমি? স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া সেও মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

সুরমা যেমন করিয়া নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসিল, নূতন বধূ তাহাতে আশ্চর্য ও শঙ্কিত হইয়া নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিল, সব কাণ্ড দেখিল। অনেকখানি সত্য তাহার মাথার ভিতরে সূর্যের আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইল, তাহারও বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত হইয়া আসিয়াছিল, চক্ষের বাহিরে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বিপদের সময় স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল।

নয়

ছয় দিন পরে ভাল করিয়া জ্ঞান হইলে, সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কেমন আছেন?

দাসী কহিল, ভাল আছেন।

আমি দেখে আসব। কিন্তু উঠিতে গিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

দাসী কহিল, তুমি বড় দুর্বল, তাতে জ্বর হয়েছে, উঠো না, ডাক্তার বারণ করেছে।

সুরমা আশা করিল যজ্ঞদাদা দেখিতে আসিবে, বৌ দেখিতে আসিবে।

একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তবু কেহ আসিল না, কেহ খোঁজও লইল না।

জ্বর সারিয়াছে, কিন্তু বড় দুর্বল। উঠিতে চেষ্টা করিলে হয়ত উঠিতে পারিত, কিন্তু বিষম অভিমানে তাহার শয্যাত্যাগ করিতে

প্রবৃত্তি হইল না। নিজের মনে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত, চোখ মুছিয়া ভাবিত—তাহাদের আলো ও ছায়া কাহিনী।

দীপ্ত আলো ও গাঢ় ছায়া লইয়া তাহারা খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, এখন আলো নিভিয়া আসিতেছে। মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিমে ঝুঁকিয়াছে, গাঢ় ছায়া তাই অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া প্রেতের মত কঙ্কালসার হইয়াছে। অজানা অন্ধকারের পানে সে ছায়া যেন মিশিয়া যাইবার জন্য ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুরমা ঘুমাইয়া পড়িল।

গায়ের উপর তপ্ত হস্ত রাখিয়া কে যেন ডাকিল, দিদি!

সুরমা উঠিয়া বলিল, একি বৌ? চক্ষু তাহার রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় যেন কালিমাখা।—কেন বৌ কি হয়েচে তোমার?

কি হয়েচে আমার। তুমি আমাকে এ-বাড়িতে এনেছিলে, তাই বলতে এসেচি দিদি, ছুটি দাও আমাকে। আমি যাব—

কেন দিদি, কোথা যাবে?

নূতন বধূ সুরমার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুরমা দেখিল তাহার দেহ অগ্নির মত উত্তপ্ত।—একি! এ যে বড় জ্বর হয়েচে।

এমন সময় একজন দাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল, দিদি, বৌ কোথা গেল? ওমা জ্বরের ঝোঁকে পালিয়ে এসেচেন! আজ আট দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। মা গো! কি করে এলেন?

আট দিন জ্বর? ডাক্তার দেখচে?

কেউ না দিদি, কেউ না, পরশুদিন সকালবেলাও বৌমা এক ঘণ্টা কলতলায় মাথা পেতে বসেছিলেন, এত মানা করলুম কিছুতেই শুনলেন না।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরমা যজ্ঞদত্তের ঘরে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল, দাদা, বৌ আর বাঁচে না।

বাঁচে না! কি হয়েচে?

আমার ঘরে এসে দেখ দাদা, বৌ বুঝি বাঁচে না।

দুই-তিনজন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল, প্রবল বিকার। সমস্ত রাত্রি বিফল পরিশ্রম করিয়া তাহারা ভোরবেলায় চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি যজ্ঞদত্ত মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল, কতবার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, বধূ কিন্তু স্বামীকে চিনিতে পারিল না।

ডাক্তার চলিয়া গেলে যজ্ঞদত্ত কাঁদিয়া উঠিল, বৌ একবার চেয়ে দেখ, একবার বল ক্ষমা করলে?

সুরমা পায়ের উপর মুখ লুকাইয়া অস্ফুটে বলিল, বৌদিদি, কেন এ শাস্তি দিয়ে গেলে?

কে কথা কহিবে? সমস্ত মান, অভিমান, তাচ্ছিল্য, অবহেলা সরাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে অনন্তে মিলাইয়া গেল।

সুরমা কহিল, দাদা কোথায়?

দাসী উত্তর করিল, কাল তিনি পশ্চিমে চলে গেছেন।

কবে আসবেন?

জানিনে, বোধ হয় শিগগির আসবেন না।

আমি কোথায় থাকব?

সরকারমশায়কে বলে গেছেন, যত ইচ্ছে টাকা নিয়ে তোমার যেখানে খুশি থেকো।

সুরমা আকাশপানে চাহিয়া দেখিল, জগতের আলো নিভিয়া গিয়াছে—সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, একটি তারাও দেখা যায় না। পাশে চাহিয়া দেখিল, সে অস্ফুট ছায়াটিও কোথায় সরিয়া গিয়াছে—চতুর্দিক ঘনান্ধকার, বক্ষ-স্পন্দন তাহার যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে, চক্ষের জ্যোতি ম্লান ও স্থির হইয়া আসিতেছে।

ঊর্ধ্বনেত্রে সুরমা ডাকিল, যজ্ঞদাদা!

তার পর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

সমাপ্ত